মাকতুবাতঃ ইমাম গাযযালী (রহঃ)

❀

অনুবাদক

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা

❀

পরিবেশক

রশীদ বুক হাউস

৬, প্যারীদাস রোড

ঢাকা—১

সূচি পত্র

বিষয়— পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়— পৃষ্ঠা—

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

উৎসর্গ

কল্যানকামিতার যে মহৎ প্রেরণায় ইমাম গায্যালী সমকালীন মুসলিম শাসক এবং দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তাগণের প্রতি এই অমূল্য উপদেশবানী গুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন,—

সেই একই প্রেরণায় উদ্বেলিত হইয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি বাংলাদেশের বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি উৎসর্গিত হইল।

—অনুবাদক

।। অনুবাদকের প্রসঙ্গ কথা ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহাত্মা ইমাম গায্‌যালীর (রঃ) ছোটভাই এবং অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর আহমদ গায্‌যালী কর্তৃক সংকলিত ইমাম গাযযালীর মাকতুবাত বা পত্রাবলী বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকগণের খেদমতে পেশ করিতে যাইয়া আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হইয়া আসিতেছে।

গাযযালী-জীবনের পরিনত মুহূর্তগুলিতে লেখা এই সমস্ত পত্রের বিষয়বস্তু যে কত মূল্যবান, তা জ্ঞানী পাঠক মাত্রই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

... ...

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামনিষী ইমাম আবুহামেদ মুহম্মদ আল গাযযালী (রঃ) খোরাসানের অন্তপাতি তুস এলাকাধীন তাহেরান নামক ক্ষুদ্র শহরে হিজরী ৪৫০ সন মোতাবেক ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রজ্জু তৈরীর কাজ ছিল তাঁহার পরিবারিক পেশা। সেই পেশার সম্পর্কেই তিনি গাযযালী নামে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া অধিকাংশ জীবনীকারের অভিমত।

অতি অল্প বয়সে পিতা এবং মাতা উভয়েই ইন্তেকাল করেন, এতিম অবস্থায় ছোটভাই আহমদ সহ পিতার এক বন্ধুর নিকট কিছুকাল লালিত-পালিত হইয়া প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কিছুকাল পর পিতার সেই বন্ধু অসহায় দুইটি বালককে প্রতিপালন করিতে অপারগ হইয়া দুজনকেই একটি আবাসিক মাদরাছায় ভর্তি করিয়া দেন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভাধর গাযযালী উস্তাদগণের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। তাহেরানের আহমদ ইবনে মুহম্মদ যারকানীর নিকট ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নের পর জুরজান শহরে ইমাম আবুনসর ইসমাঈলীর নিকট কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই গাযযালীর জ্ঞানস্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, তা পূরণ করা সাধারণ উস্তাদগণের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তাই উস্তাদগণের পরামর্শক্রমেই তিনি তদানিন্তন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নিজামিয়া মাদরাছায় গিয়া ভর্তি হন। মুসলিম জাহানের সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাছা।

সেলজুক সুলতানগণের স্বনামধন্য উজির নিজামুল মুলক তুসী ছিলেন এই মাদরাছার প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষক। ইমামুল হারামাইন আবদুল মালেক জিয়াউদ্দীন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ।

আল্লামা আবদুল মালেক জিয়াউদ্দীন দীর্ঘকাল পবিত্র মক্কা-মদীনায় অবস্থান করিয়া সমগ্র মুসলিম জাহান ব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার উপাধী হইয়াছিল—ইমামুল-হারামাইন''।

গাযযালী যখন ইমামুল হারামাইনের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে হাজির হন, তখন ইমাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে চারশতাধীক বিশিষ্ট শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গাযযালী ইমামুল হারামাইনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাগরেদে পরিণত হইলেন।

ইমাম সাহেব মন্তব্য করিতেন, আমার সাগরেদগণের মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভাধরেরা রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের সকলের মধ্যে গাযযালী অনন্ত প্রতিভার অধিকারী,—গাযযালী যেন অতল সমুদ্র।

ইমামুল হারামাইন গাযযালীর ন্যায় সাগরেদকে নিয়া গর্ব করিতেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার সময়ই ইমাম সাহেব গাযযালীকে মাদরাছার একজন সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন। ইমাম সাহেবের জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্য্যন্ত গাযযালী প্রিয় উস্তাদের সাহচর্য্য ত্যাগ করেন নাই।

নিশাপুরে ইমামুল হারামাইনের সাহচর্য্যে থাকা অবস্থাতেই গাযযালী কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাত হইয়া উঠেন। 'মান্‌খুল' নামক ফেকাহ্‌-শাস্ত্রের সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে প্রিয় উস্তাদ ইমামুল হারামাইন মন্তব্য করিয়াছিলেন,—আমার গতি যেখানে শেষ,—গাযযালী সেখান হইতে যাত্রা শুরু করিতেছে। আমি তাহার এই গৌরবময় যাত্রাপথে আশীর্বাদবানী—বর্ষন করি।''

গাযযালীর বয়স যখন ২৮ বৎসর তখন ইমামুল হারামাইনের ইন্তেকাল হয়। ইমামের তিরোধানে সারাদেশে দীর্ঘ একবৎসর ব্যাপী সরকারী ভাবে শোক পালিত হয়। শোকে উন্মত্ত জনগণ মসজিদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলে। শিক্ষার্থীগণ দোয়াত-কলম ভাঙ্গিয়া পথে বাহির হইয়া আসেন। পথে পথে শোকগাথা গাহিয়া তাঁহারা এলেমের দুর্দ্দিন ঘোষণা করিতে থাকেন।

প্রিয় উস্তাদের তিরোধানে মর্মাহত গাযযালীও নিশাপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে মনস্থ করেন। তাঁহার শিক্ষা-জীবন অনেক আগেই সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রিয় উস্তাদের ছায়া মাথার উপর হইতে উঠিয়া যাওয়ার পর তিনি তদানিন্তন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ আবু আলী ফারমাদির নিকট হাজির হইয়া অধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জ্জনে রতী হন।

যে সময় ইমাম গাযযালী একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর আলেম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন, সেই সময় মুসলিম দুনিয়ায় আলেম-উলামাগণের সমাদর ছিল। আমীর-ওমরাহগণ পর্য্যন্ত আলেমগণকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। ইমামুল হারামাইন কোন সময় উজিরে আজম নিজামুল মুলকের দরবারে হাজির হইলে নিজামুল মুলক দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন।

আল্লামা আবু ইসহাক সিরাজী ছিলেন বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাছার অধ্যক্ষ। তিনি খলিফার বিশেষ দূতরূপে বাগদাদ হইতে নিশাপুর আগমন কালে যে সমস্ত শহর জনপদ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পথে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া-ছিলেন। লোকেরা বহু মূল্যবান সামগ্রী পথিপার্শ্বে সাজাইয়া রাখিয়া উপঢৌকন হিসাবে সেই সমস্ত আল্লামার পদতলে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

আবদুল গাফের ফারেছী লিখিয়াছেন,—ইমাম গাযযালী প্রথম জীবনে অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং জৌলুষপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। নিশাপুর হইতে তিনি যখন বাগদাদে আগমন করেন, তখন তাঁহার গায়ে অন্ততঃপক্ষে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের পোষাক শোভা পাইতেছিল।

উজির নিজামুল মুলক পূর্ব হইতেই গাযযালীর প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাগদাদে আগমনের পর তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং এই অল্প বয়সেই নিজামিয়া মাদরাছার অধ্যাপক হিসাবে তাঁহাকে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

নিজামিয়ার অধ্যাপনাপদ তখন এমন মর্য্যাদার ছিল যে, দেশের শীর্ষ স্থানীয় জ্ঞানীগণ এই পদ লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। দেশের রাজনীতির সঙ্গেও অধ্যাপকগণের গভীর সম্পর্ক থাকিত। যে কোন জাতীয় সঙ্কটের সময় নিজামিয়ার শিক্ষকগণ সংকট নিরসনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেন। অধ্যাপনা জীবনে একবার বাগদাদের খলিফা এবং খুরাছানের সুলতানের মধ্যে স্পষ্ট একটি মতভেদ দূর করার ব্যাপারে ইমাম গাযযালী সাফল্যজনক দৌত্যকার্য্য সম্পাদনা করিয়াছিলেন। খোদ বাগদাদের খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারেও এক সময় ইমাম সাহেবের একটি প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ফলে ইমাম সাহেবের মর্য্যাদা উজিরগণের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হয়। ৩৪ বৎসর বয়সে ইমাম সাহেব নিজামিয়া মাদরাছার প্রধান হিসাবে নিয়োজিত হন।

... ...

অধ্যাপনা জীবনের দশবৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইমাম গাযযালী যখন খ্যাতি এবং মর্য্যাদার শীর্ষদেশে সমাসীন, তখন তাঁহার মধ্যে মহাসত্যের অনন্ত অন্বেষা জাগ্রত হয়।

জ্ঞান চর্চ্চার বিভিন্ন শাখায় অবাধ বিচরণের ফলে ইমাম সাহেব লক্ষ্য করিলেন, ফেকাহ, তাসাওফ এবং দর্শন চর্চ্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধনের পরও মুসলিম জাতি ধীরে ধীরে একদিকে যেমন ভোগ-বিলাসের পংকে ডুবিয়া প্রকৃত ইসলামী চরিত্র হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে জ্ঞানীগুণীগণ পর্য্যন্ত স্থুল ভোগ-বিলাসের আকর্ষণে পড়িয়া প্রকৃত আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন! স্পেনে মুসলমানদের শোচনীয় পতন এবং বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফতের অমিত শৌর্য-বীর্য্যের অবসান, মুসলিম সমাজের আত্মশক্তির দুর্বলতা হিসাবে ইমাম সাহেবের দিব্যচক্ষে ধরা পড়িল। ইমাম সাহেব গভীরভাবে চিন্তা করিতে শুরু করিলেন,—এই পতনের কবল হইতে মিল্লাতকে উদ্ধার করার পথ কি?

গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তাঁহার সুদূর প্রসারী চিন্তাশক্তিতে ধরা পড়িল, ইসলামের মূল শিক্ষা আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সাধন করা না গেলে মিল্লাতের এই পতন রোধ করা সম্ভব হইবেনা।

ইমাম সাহেব পূর্ব হইতেই আধ্যাত্মিকতার সাধনা করিতেন। কিন্তু বাগদাদের বিলাসপূর্ণ পরিবেশ, বিশেষতঃ উচ্চ মর্য্যাদাপুর্ণ আসনে উপবিষ্ট

অবস্থায় সেই সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ এবং জাতিকে সেই সাধনার পথে উদ্বুদ্ধ করার স্বপ্ন সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সবকিছু ছাড়িয়া অনন্ত অন্বেষার পথে বাহির হওয়াই সাব্যস্ত হইল। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ন্যুনাধীক চল্লিশ বৎসর বলিয়া জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম সাহেবের এই নিরুদ্দিষ্ট জীবন বার বছরের কাছাকাছি। বাগদাদ হইতে বাহির হইয়া সর্বপ্রথম তিনি দামেস্কে চলিয়া যান। সেখানকার উমাইয়া মসজিদের সংলগ্ন একটি অপরিসর কামরায় দুই বৎসরকাল তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দামেস্ক হইতে বাইতুল মোকাদ্দাস এবং শেষে পবিত্র মক্কা-মদীনাতেও অবস্থান করেন। তাঁহার অমর গ্রন্থ এহ্‌ইয়াউল-উলুমুদ্দিন এই নিরুদ্দিষ্ট জীবনেরই রচনা। কথিত আছে, এক খতম কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া তিনি এই মহাগ্রন্থের এক একটি অধ্যায় রচনা করিতেন।

গাযযালী-জীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে ইবনুল জওযী বর্ণনা করেনঃ—খদ্দরের মোটা পোষাক ছিল তখন ইমাম সাহেবের অঙ্গভূষন। সবসময় তিনি রোযা রাখিতেন। জীবিকার জন্য 'কিতাবাত' বা লেখার কাজ করিতেন! এতে যৎসামান্য যা কিছু আয় হইত তদ্দারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

একদা বাগদাদে মহামূল্য পোষাক পরিহিত বিশিষ্ট আমীর-ওমরাহগণের হিংসা উদ্রেককারী জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত গাযযালী পিঠের উপর একটি পুটলী বগলে কয়েকখানা কিতাব এবং হাতে একটি লোটা নিয়া মরুভূমির পথে সংসারত্যাগী দরবেশগণের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। এই অবস্থাতেই দীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ান।"

দীর্ঘ নিরুদ্দিষ্ট জীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হজ্জ ও যিয়ারত শেষে ইমাম সাহেব জন্মভূমি তুসে ফিরিয়া আসেন। তখন হইতে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসার পর একটি মাদরাছা এবং তৎসংলগ্ন একটি বিরাট খানকাহ নির্মাণ করিয়া পুনরায় শিক্ষাদান কার্য্য শুরু করেন। জীবনের শেষ পাঁচটি বৎসর এখানেই কাটিয়া যায়। শত-শত লোক এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নিকট উচ্চতর দ্বিনী এলেম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।

ইমাম সাহেবের ছোট ভাই আহমদ গাযযালী বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেবের বয়স পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর একদিন ফজরের নামাযের পর কাফনের কাপড় হাতে নিয়া তিনি হুজরা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বলিতে লাগিলেন—'প্রিয়তম ! বান্দা হাজির !

সাগরেদগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। ইমাম সাহেব সকলকে লক্ষ্য করিয়া শুধু একটি মাত্র উপদেশ বাণী উচ্চারণ করিলেনঃ—তোমরা নিষ্ঠাবান হও ! এবাদতে এখলাছ এখতিয়ার কর !।

বর্ণনাকারীগণ বলেন,—কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া ইমাম সাহেব হুজরায় প্রবেশ করিলেন এবং শুইয়া পড়িলেন। সাগরেদগণ মনে করিলেন, বোধ হয় তিনি একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতে চান। কিন্তু সামান্য কিছুক্ষনের মধ্যেই তাঁহার অমরআত্মা পরম-প্রিয় মাওলার সন্নিধানে চলিয়া গেল। দেখা গেল,—বুকের উপর বোখারী শরীফ জড়াইয়া ধরিয়া তিনি যেন পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা যাইতেছেন।

মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে ইমাম গাযযালী ইন্তেকাল করেন। তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত জীবন এতই চমকপ্রদ এবং বহুমুখী কর্মপ্রবাহে বিস্ময়কর যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর আর কোন নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরবর্তী যুগের মনীষীগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, গাযযালীর জীবন রছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের একটি বিস্ময়কর মোজেযা ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যথায় এমন এক অসহায় এতীম, যাহাকে শুধু ভরণ-পোষণের জন্য মাদরাছায় ভর্তি করা হইয়াছিল, যিনি যৌবনে সমকালীন সমাজ-জীবনে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা এবং বিষয়-বৈভবের অধিকারী হইয়াও শুধুমাত্র সত্য তালাশের খাতিরে সব কিছু ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইলেন এবং দীর্ঘ দশবৎসরাধীক কাল পথে-প্রান্তরে ফকীরের জীবনযাপন করিলেন, তাঁহার দ্বারা এত বিভিন্নমুখী কাজ এবং হাজার হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর হইল কিরূপে? ইমাম সাহেব 'জাওহারুল কুরআন' নামে যে তফছীর রচনা করিয়াছিলেন, তা চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। দুঃখের বিষয়, তাতারীদের দ্বারা বাগদাদ লুণ্ঠিত হওয়ার সময় সেই মহামূল্যবান তফছীর গ্রন্থটি বিনষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সত্তরটিরও অধিক বিরাট

বিরাট গ্রন্থ আজও পর্যন্ত মওজুদ রহিয়াছে, যার যে কোন একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য বেশ কয়েক বৎসরের প্রয়োজন।

এহ্ইয়া উলূমুদ্দিন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া পাশ্চাত্যের মনীষীগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, এই একটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করার জন্য গায্যালীর সমগ্র জীবন যথেষ্ট ছিল না।

... ...

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইমাম গাযযালীকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী হিসাবে স্বীকার করার পরও তাঁহার আধ্যাত্মিকত্ব-ভিত্তিক দার্শনিক চিন্তা-ধারাকে পতনপর মুসলিম জাতির নৈরাশ্যবাদী চিন্তাধারার অভিব্যক্তি বলিয়া অভিহীত করেন। তাঁহাদের ধারনায় বাগদাদের পতনের করুন দৃশ্য গাযযালীকে দুনিয়ার জীবনের অনিত্যতা এবং পার্থিব শক্তির অসারতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল; ফলে তিনি তাঁহার জাতির সম্মুখে দুনিয়াবিমুখ চিন্তাধারা তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই অভিমত একশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের মনেও গাযযালী দর্শন সম্পর্কে ভুল ধারনার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপীয় সমালোচকগণের উপরোক্ত অভিমত যে ইতিহাসের বিচারেও কতবড় ভুল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা সেই যুগের ইতিহাস একটু সচেতনভাবে পাঠ করিলেই চোখে পড়ে।

প্রথমতঃ গাযযালী-যুগে বাগদাদের জৌলুষ বিলুপ্তির পথে দ্রুত ধাবমান হওয়া সত্ত্বেও মাগরবের ইউছুফ বিন তাশ্ফিনের বিস্ময়কর অভ্যুদয় এবং সেলজুকীদের সুবিশাল রাজত্ব মুসলিম শৌর্য্যবীর্য্যের অপ্রতিহত অগ্রগতি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমভাবে প্রকম্পিত করিয়া রাখিয়াছিল। বৈষয়িক উন্নতিতে মুসলমানগণ তখন এমন এক স্তরে অবস্থান করিতেছিলেন, যা অন্য যে কোন সময়ের প্রাচুর্য্যকে ম্লান করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন এলাকায় মুসলমানদের সাময়িক পতনে ইসলামের পতন হয় না। ইসলাম বিশেষ কোন জনগোষ্ঠী কিংবা এলাকাবিশেষের সহিত সম্পৃক্ত নয়। ইসলামের জীবন-ধারা অনুসরণ করিয়া দুনিয়ার যে কোন এলাকার জন-মানুষই উন্নতির চরম শিখরে আহোরণ করিতে পারে।

গাযযালী যুগে বাগদাদে এবং স্পেনে আরবীয় মুসলমানদের পতন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তী কয়েকশত বৎসর সমগ্র দুনিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী তুর্কী মুসলমানদের নব অভিযাত্রার তখন সূচনা মাত্র। সুতরাং গাযযালীকে পতনযুগের মানসিকতায় আচ্ছন্ন বলিয়া যাঁহারা বিচিত্র করিতে চান, তাঁহারা ইতিহাসকেই বিকৃত করিতে চান। মাগরেবের ইউসুফ বিন তাশফীন এবং মাশরেকের আলপ্ আরসালানের মহা প্রতাপ গাযযালীর যৌবন কালের ঘটনা। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নৈরাশ্যপূর্ণ মানসিকতার শিকার হওয়ার প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

... ...

গাযযালী ছিলেন হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের মোজাদ্দেদ। হিজরী পাঁচশত বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিরুদ্দিষ্ট জীবন হইতে ফিরিয়া আসেন। পরবর্তী পাঁচ বৎসর তাঁহার জীবন উম্মতের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হইয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে গাযযালীর যুগ ছিল ভোগ-বিলাস এবং বৈষয়িক উন্নতির অবিশ্বাস্য উন্নতির যুগ। বিত্ত-বৈভবের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম আমীর-ওমরাহগণের মধ্যে এলেমের কদর ছিল। আলেমের মর্য্যাদা ছিল। কিন্তু এই পরিবেশের মধ্যেও ইমাম গাযযালীর অন্তর্দৃষ্টি বৈভবপূর্ণ জীবন এবং জৌলুষপূর্ণ এলেম-চর্চার মধ্যে পার্থিব লোভ লালসার বিকৃতি ও তার অবশ্যম্ভাবি পরিণতি হিসাবে গোটা উম্মতের আত্মিক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

প্রাচুর্য্যের সঙ্গে বিকৃতির আমদানী নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ইমাম সাহেব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই বিকৃতিতে ধীরে ধীরে উম্মতে মোহাম্মদীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এর পরিণতি আদর্শিক মৃত্যু, ইসলামের রুহ হইতে জঘন্য বিচ্যুতি।

ইমাম সাহেবের মাধ্যমে হয়ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাতিকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অন্তরে আবেহায়াতের অন্বেষা জাগ্রত হয়। যে আবেহায়াত পান করিয়া জাতির প্রাণশক্তি নতুন করিয়া উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। যে আবেহায়াত পরবর্তীকালে মুসলিম শৌর্য্যবীর্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবে। তাই বাগদাদের মহামর্য্যাদাপূর্ণ জৌলুষময় জীবনের

মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি অজানার পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কঠোর সাধনার মাধ্যমে উম্মতের জন্য আবেহায়াতের সন্ধান করাই ছিল তাঁহার এই অভিযানের লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্যপথে ইমাম গাযযালী কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁর এহ্ইয়াউল উলুমুদ্দিন বা ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন পাঠ করিলেই তা অনুভব করা যায়।

শুধু কিতাব লিখিয়াই কি গাযযালী তাঁর সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছিলেন? মুসলিম জাতির জন্য তিনি যে আবেহায়াতের উৎস আবিষ্কার করিয়াছিলেন যদ্বারা প্রথমে একটি অত্যাচারী এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধে পরিবর্তন সাধণকারী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইসলামী বিবেক জাগ্রত করার কাজ শুরু করেন। মুহম্মদ বিন তুমারাতকে সেই অনাচারী ধর্মীয় চিন্তাধারায় বেদয়াত সৃষ্টিকারী নেকাবপোশদের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করিয়া তোলেন। মোয়াহ্‌হেদীনদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইহাই গোড়ার কথা।

খৃষ্টান ইউরোপের দ্বারদেশে প্রতিষ্ঠিত মোয়াহহেদীনদের সেই হুকুমতের ভিত্তিই গড়িয়া উঠিয়াছিল ইমাম গাযযালীর শিক্ষা ও দর্শনের উপর। ইতিহাসবেত্তা আল-ইয়াফেয়ী লিখিয়াছেন,—"ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনাচার সৃষ্টিকারী নেকাবপোশ'দের উৎখাত করায় পিছনে ইমাম গাযযালীর পরামর্শ এবং উৎসাহই সর্বাপেক্ষা বেশীকাজ করিয়াছিল। মোয়াহ্‌হেদীন শাসকগণের মধ্যে ইমাম সাহেবের শিক্ষা কতটুকু কার্য্যকরী হইয়াছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইয়াকুব বিন ইউছুফ বিন আবদুল মোমেনের গৌরবজনক শাসনকাল। তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বিশটিরও বেশী যুদ্ধ জয় করিয়া শৌর্যবীর্য্যের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইউরোপের অগ্রগামী শক্তিসমূহকে উচিত শিক্ষা দান করিয়া এই মহান নৃপতি মাগরেবের মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল শাসনকার্য্য পরিচালনা করার পর এই দরবেশ বাদশাহ সংসার ছাড়িয়া ফকীরের বেশে পথে বাহির হইয়া যান এবং একযুগেরও অধিককাল অজ্ঞাত জীবন যাপন করার পর দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। কোথায় তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই খবর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের পক্ষেও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই।"

গাযযালীর শিক্ষা মুসলিম সমাজে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বিশেষতঃ ৬ষ্ঠ শতকের মোজাদ্দেদ হিসাবে তিনি মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি কতটুকু উদ্দীপিত করিয়াছিলেন তার প্রত্যক্ষ আরও দুইটি প্রমাণ হইতেছে সিংহহৃদয় সুলতান সালাহউদ্দীন এবং গাযী নূরুদ্দীন জঙ্গীর অবিস্মরণীয় আদর্শ জীবন। ইতিহাসবেত্তাগণ লিখিয়াছেন, দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতা সালাহ-উদ্দীন আইয়ুবীর ইন্তেকালের পর তাঁহার ব্যক্তিগত তহবিলে মাত্র একটি সিরীয় স্বর্ণমুদ্রা এবং চল্লিশটি তামার পয়সা পাওয়া গিয়াছিল।

সুলতান নুরুদ্দিনের মৃত্যুশয্যা সম্পর্কে জীবনীকারগণ লিখিতেছেন,—"সুলতানকে চিকিৎসকগণ একটি ক্ষুদ্র কামরায় অত্যন্ত মামুলী বিছানার উপর শায়িত অবস্থায় দেখিতে পান। অধিক রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। গাযযালীর এহ্‌ইয়াউল উলুম গ্রন্থটি ছিল তাঁহার সর্বক্ষণের সঙ্গী।"

... ...

সংসারত্যাগী ইমাম গাযযালী মহাবীর আলপ্‌ আরসালান প্রতিষ্ঠিত খোরাসানের প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান এবং বিশ্ববিশ্রুত উজিরগণের নামে যে সমস্ত পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইগুলির ছত্রে ছত্রে সূক্ষ্ম জ্ঞান দানের সঙ্গে সঙ্গে শাসনের যে সুরটি লক্ষ্য করা যায়, তা তাঁহার মোজাদ্দেদসুলভ প্রজ্ঞা এবং কর্তব্যবোধের দর্পন হিসাবে ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। উত্তরে কাশগড়, দক্ষিণে সিরিয়া ও ইরাক এবং পূর্বে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ইহাদের সালতানাত বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট সালতানাতের অধিপতি এবং অপরিসীম ক্ষমতাধর উজিরগণকে ইমাম সাহেব যে ভাষায় শাসাইয়াছেন, তা একজন সংসারত্যাগী ফকিরের পক্ষে কতটুকু দুঃসাহসের ব্যাপার পাঠক মাত্রই সেই কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মকতুব বা পত্রগুলি ইমাম সাহেবের পরিণত বয়সের অর্থাৎ সাধনা জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে লিখিত। এইগুলির মধ্যে আধ্যাত্ম জ্ঞানের যে সূক্ষ্মতম তথ্যাদি পরিবেশন করা হইয়াছে তা এক কথায় অনন্য। বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নামে এই সমস্ত পত্র লিখিত হইলেও এইগুলির আবেদন সর্বকালে দুনিয়ার সকল মানবগোষ্টির মধ্যেই অমর অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

দুঃখজনক হইলেও এই কথা সত্য যে বাংলাভাষায় ইমাম গাযযালীর কিতাবাদির অনুবাদ অক্ষমতার শিকারে পতিত হইয়াছে। আরবী ফারছী ভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকেরাই প্রধানতঃ গাযযালীর গ্রন্থাবলী অনুবাদ করার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার পরও এই কথা বলিতেই হয় যে, গাযযালীকে না বুঝিয়াই তাঁহার শিক্ষা ভাষান্তরিত করার দুঃসাহস এই মহান সংস্কারক সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানদান করাতো দূরের কথা, অনেক স্থলে ভুল ধারণা সৃষ্টি করিতে সহায়ক হইয়াছে।

মকতুবাতের অনুবাদ করিতে গিয়াও আমাদিগকে কম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। পানিতে না নামিয়া সাঁতার অনুশীলন করার ন্যায়; আধ্যাত্মিকতার ময়দানে কোনরূপ অগ্রগতি ব্যতিরেকেই গাযযালীর বাণী ভাষান্তরিত করিয়া পরিবেশন করার ধৃষ্টতা আমরাও প্রদর্শন করিতেছি। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ সাফল্যের দাবী করা আমাদের পক্ষেও শোভন হইবে না। ভিন্ন ভাষার লৌহ যবনিকার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পরম জ্ঞানের এই মহা ভাণ্ডার চিরকাল বাংলাভাষাভাষীগণের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরেই থাকিয়া যাইবে, এই পরিস্থিতিও তো সহ্য করা যায় না।

বাংলাদেশের একদা পর্যুদস্ত কৃষকের সন্তানেরাই আজ আল্লাহর মেহেরবাণীতে রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বস্তরে সমাসীন। প্রায় দুইশত বছরের গোলামীর পর সেই নির্য্যাতীত মুসলিম কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের হাতে আল্লাহ রাববুল আলামীন স্বাধীনতার স্বুবর্ণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মহান পরওয়াদিগারের সেই মহাদানকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর জন্য আজ গাযযালীর ন্যায় মহান চিন্তানায়ক মুরদেখোদার আহরিত আবেহায়াতের প্রয়োজনীয়তা বড় তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। সেই অনুভূতির তাকিদেই মাকতুবাতে ই গাযযালী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করার এই প্রয়াস।

অনুবাদ কর্মে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেহনত করিয়াছি। আল্লাহ তা'লা আমাদের সেই প্রচেষ্টা কতটুকু সফল করিয়াছেন, তা পাঠকগণের বিবেচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়ার আগে বলা মুস্‌কিল।

মহান পরওয়ারদিগারের প্রতি শুকরিয়ার ছেজদা জানাই, তিনি আমার ন্যায়

একটি 'ছিয়াহ্‌কারকে দিয়া তাঁহার এক মহান ওলীর অমূল্য শিক্ষা বাংলা ভাষাভাষীগণের খেদমতে পেশ করার তওফীক দিয়াছেন।

রশীদ বুক হাউসের সত্বাধিকারী বন্ধুবর জনাব মোঃ মাহ্‌বুবুর রহমান খান এবং তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্মিনীর আগ্রহাতিশয্য এবং আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে এই অমূল্য গ্রন্থটি দ্রুত পাঠকসমাজের সম্মুখে পেশ করা সম্ভব-পর হইল। মাহবুবুর রহমান খান এবং আমার সেই মহৎপ্রাণা ভগ্নিকে আল্লাহ তা'লা দ্বিনী গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের আরও তওফীক দান করুন, অধম অনুবাদকের ইহাই আন্তরিক দোয়া।

কোন কিছু লিখিতে বসিলেই আমার জান্নাতবাসী আব্বা ও আম্মার কথা মনে পড়ে। বাংলাভাষায় আল্লাহর দ্বীনের কথা প্রচার করার জন্য তাঁহাদের কি যে উৎসাহ ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রদ্ধেয় পাঠকগণের খেদমতে [illegible]বজ, নেক দোয়ার সময় আমার পরলোকগত আব্বা-আম্মার কথাও যেন অনুগ্রহ করিয়া একটু স্মরণ করেন।

আমি অক্ষম অজ্ঞান। ভুল-ভ্রান্তি হওয়া আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কাহারো চোখে কোন ভুল ধরা পড়িলে অনুগ্রহপূর্বক তা পত্রযোগে জানাইলে কৃতার্থ হইব। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেই সমস্ত ভুল সংশোধিত হইলে তাঁহারাও ছওয়াবের ভাগী হইবেন।

দীন সেবক
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্য্যালয়, ঢাকা
২৭ শে রজব রাত্রি, ১৩৯৭

প্রথম অধ্যায়।।
বাদশাহগণের উদ্দেশ্যে ঃ

প্রসঙ্গ কথা

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালীর যশগাথা চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াদার আলেমদের একটি দল তাঁহার প্রতি হিংসা-কাতর হইয়া নানাভাবে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে শুরু করে।

এলমে-দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা লাভ করার উদগ্র লালসায় যে সমস্ত ভণ্ড প্রকৃতির লোক নানা বেশে নানা কুপন্থা অবলম্বন করিয়া সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং বিত্তবাণ শ্রেণীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জীবনের সকল সাধনা নিয়োজিত করিয়া আখেরাত বরবাদ করিয়া থাকে, "এহইয়া উল্ উল্‌মুদ্দীন" কিতাবে সেই সমস্ত কপট মনুষ্যরূপী নরকের কীটদের স্বরূপ উদঘাটন করিতে যাইয়া ইমাম সাহেব যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ভণ্ড-দুনিয়া পুরুস্ত আলেমগণ সেই জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ইমাম সাহেবকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-অভিযান শুরু করে।

এই সময় খোরাসানের শাসক ছিলেন সুলজুকী বংশের সুলতান সন্‌জর বিন মালেক শাহ। সুলজুকী খান্দানের সুলতানগণ ইমাম আবু হানিফার অনুসারী এবং হানাফী ফেকার ভক্ত ছিলেন। ইবনে খাল্লেকানের বর্ণনা অনুযায়ী সুলজুকী সুলতানগণই ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মাজারের উপর সুদৃশ্য গম্বুজ নির্মান করাইয়া অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রথম জীবনে ইমাম গাযযালী ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কিত একটি পুস্তিকায় ইমাম আবু হানিফার সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমালোচনার তীব্রতা কোন কোন স্থানে শোভনতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। অবশ্য পরিণত বয়সে ইমাম গাযযালী তাঁহার সেই মতামত প্রত্যাহার এবং উক্ত পুস্তিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুরা সেই পুস্তিকাটিকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া হানাফী ফেকাহ্র প্রতি সীমাহীন ভক্তি পোষণকারী খোরাসানের বাদশাহর নিকট ইমাম সাহেব সম্পর্কে নানা প্রকার ভিত্তিহীন অভিযোগ পেশ করে। তারা এতটুকু পর্যন্ত বলিয়া দেয় যে, ইমাম গাযযালীর ধর্ম-বিশ্বাসই সন্দেহযুক্ত। আল্লাহর নূর সম্পর্কে তিনি অগ্নি উপাসকদের অনুরূপ আকীদা পোষন করেন। গ্রীক দার্শনিকদের ভাষার মারপ্যাচে সাজাইয়া তিনি ইসলামী ঈমান-আকীদার গোড়া বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে এমন অনেক কথা রহিয়াছে যা তাঁহার ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত করার জন্য যথেষ্ট।

‘মাগরেবে-আকসা’ বা মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি এলাকার লোকেরা ছিলেন মালেকী ফেকাহর অনুসারী। মালেকী মাজহাবের কোন কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ইমাম গাযযালী সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই মাজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম আবু বকর আল-বাকেল্লানী তখনও জীবিত। তিনি ইমাম গাযযালীর সমালোচনার জবাব দিয়াছিলেন। জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তিনিও ইমাম সাহেবের সমালোচক ছিলেন।

সুলতান সন্জর ছিলেন সরল প্রকৃতির লোক। এলমে-দ্বীনে তাঁহার ভাল অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে আলেমবেশী ভণ্ডদের কথা বিশ্বাস করিয়া বাদশাহ ইমাম সাহেবকে দরবারে তলব করার নির্দ্দেশ দেন।

শেষ জীবনে ইমাম সাহেব এই মর্মে শপথ করিয়াছিলেন যে, অবশিষ্ট জীবন তিনি কোন বাদশাহর দরবারে যাইবেন না, কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা কবুল করিবেন না এবং বহছ-মুনাজারা করিয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করিবেন না।

কিন্তু বাদশাহর নির্দেশ অমান্য করার উপায় ছিল না। তাই খুরাসানের উপকণ্ঠে ‘মাশহাদে রেযা’ নামক স্থান পর্যন্ত গিয়া বাদশাহকে উদ্দেশ্য করিয়া সরল ফারসী ভাষায় একটি পত্র লিখিয়া পাঠান। পত্রটি ছিল এইরূপ ঃ

ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের বাদশাহকে দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের জীবনেও এমন বাদশাহী দান করুন, যার তুলনায় দুনিয়ার বাদশাহী তুচ্ছ এবং মূল্যহীন বলিয়া মনে হয়। এবং তা আখেরাতের অনন্ত জীবনে যেন কাজে আসে। কেননা, দুনিয়ার বাদশাহীর সীমানা পৃথিবীর পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে,—এর বেশী নয়। মানুষের বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত বৎসরের বেশী হয় না। আখেরাতের জীবনে আল্লাহ পাক যে বাদশাহী দান করিবেন, তার তুলনায় সমগ্র সৃষ্টি জগত একটি ধূলি কনার বরাবরও নয়। তাই সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহীও সেই ধূলি কনার একটা ভগ্নাংশ হিসাবেও গন্য হইতে পারে না। ধূলিকনা এবং তার ভগ্নাংশের কিই বা মূল্য হইতে পারে? চিরস্থায়ী বাদশাহীর মোকাবেলায় একশত বৎসরের জীবনেরই বা কি মূল্য রহিয়াছে যে তা অর্জন করিয়াই মানুষ অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়িবে?

হে ইসলামের বাদশাহ! আপনার খান্দান যেরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সৌভাগ্যের শীর্ষে উন্নীত হইয়াছে, আপনিও সেই অনুপাতে সৎসাহস এবং সৎকাজ করার মনোবল অর্জন করুন। আল্লাহর তরফ হইতে পরকালের সেই অনন্ত বাদশাহী হাছিল না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হইবেন না।

এই সৌভাগ্য যাহা দুনিয়ার অন্যান্যদের জন্য কঠিন সাধনাসাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু হে পূর্বদেশের বাদশাহ্! আপনার পক্ষে তা অত্যন্ত সুলভ। কেননা, রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন,—“কোন ন্যায়পরায়ন বাদশাহের এক দিনের ন্যায়বিচার ষাট বৎসরের বিরামহীন এবাদতের চাইতে উত্তম।”

আল্লাহ তা’লা যখন আপনাকে রাজ্য শাসন ক্ষমতার দওলত দান করিয়াছেন, তখন অন্যান্যরা ষাট বৎসরে যা করিতে পারে, আপনি এক দিনের মধ্যেই তা করিতে পারেন। অবশ্য এরদ্বারা দুনিয়ার বাদশাহী এবং সৌভাগ্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে যদি আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে ইহা আপনার দৃষ্টিতে অবশ্যই একটি মূল্যহীন তুচ্ছ জিনিষ বলিয়া মনে হইবে। কেননা, জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, দুনিয়া যদি একটা সোনার কলসী সাদৃশও হয়, তবুও যেহেতু ইহা চিরস্থায়ী নয়, এই জন্য ইহা মূল্যহীন।

অপর পক্ষে দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত যদি একটি মাটির কলসীও হয়, তবুও যেহেতু উহা চিরস্থায়ী সেইজন্য উহার মূল্য অনেক বেশী। বুদ্ধিমান লোক-মাত্রই ক্ষণস্থায়ী সোনার কলসীর চাইতে চিরস্থায়ী মাটির কলসীটিই গ্রহণ করা উত্তম বলিয়া মনে করিবে।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, অবস্থা যদি সম্পূর্ণ বিপরিত হয়,—অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন একটা ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী মাটির পাত্রবিশেষ এবং আখেরাত চিরস্থায়ী স্বর্ণ-পাত্র বিশেষ, তখন যে ব্যক্তি আখেরাতের সেই মহামূল্যবান সম্পদ ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদের পিছনে ছুটে, সেই ব্যক্তিকে কি বুদ্ধিমান বলা যাইবে?

এই তথ্য যখন পরিষ্কার হইয়া গেল যে, একদিনের ন্যায়-বিচার ষাট বৎসরের এবাদতের সমতুল্য, তখন আমি আপনার সম্মুখে ন্যায় বিচারের একটি মওকা পেশ করিতেছি। তুস এলাকার প্রজা সাধারণের প্রতি সহৃদয় হউন। ইহারা অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে। প্রচণ্ডশীত এবং অনাবৃষ্টির দরুন ফসল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। শত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষও খরা কবলিত হইয়া মূলসুদ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে। কৃষকদের শরীরে অস্থি ও চর্মটুকু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নাই। ইহাদের সন্তানেরা আজ অন্ন-বস্ত্রের অভাবে ধুকিতেছে। এমতাবস্থায় ইহাদের শরীরের চামড়াটুকু টানিয়া তোলার মত সুযোগ আর দিবেন না। এই সময় যদি ইহাদের নিকট হইতে রাজস্ব বাবদ কিছু আদায় করার চেষ্টা করা হয়, তবে ইহারা হয়ত পাহাড় জঙ্গলে পালাইয়া গিয়া পাষানে মাথা ঠুকিয়া মরিতে চেষ্টা করিবে।

হে ইসলামের বাদশাহ! আপনার জ্ঞাতার্থে বলিতেছি; বর্তমানে আমার বয়স তিপ্পান্ন। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি এলেমের সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়াছি, ফলে আমার অনেক কথাই এই যুগের জ্ঞানী সমাজের মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী সুলতান শহীদের রাজত্বকালের বিশটি বৎসর আমি দেখিয়াছি। ইসপাহান এবং বাগদাদে তাঁর প্রতিপত্তি দেখিয়াছি, একাধিকবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া তাঁহার দূত হিসাবে খলিফার দরবার পর্য্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। এলমেদ্বীনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুন সত্তরটি কিতাব লিখিয়াছি, এই সমস্ত দিকের বিবেচনায় দুনিয়াকে যথার্থভাবে দেখার সুযোগ

আমার হইয়াছে। সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া বর্তমানে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বিহিন নিরিবিলি জীবন যাপন করিতেছি।

বেশ কিছুকাল মক্কা শরীফ এবং বাইতুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করার পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র মাজারে হাজির হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, কোন বাদশার দরবারে আর যাইব না, কোন বাদশার কোন প্রকার বৃত্তি ভোগ করিব না। বহস-মোনাজারা বা তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইব না। গত বার বৎসর যাবৎ এই প্রতিজ্ঞার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। স্বয়ং খলিফা এবং অন্যান্য বাদশাহগণ এই নগন্য আশীর্বাদককে অপারগ মনে করিয়াই আমার নিজের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

জানিতে পাইলাম, আপনি আমাকে দরবারে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। আপনার ফরমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আমি 'শহীদরেযা' পর্য্যন্ত আসিয়াছি, কিন্তু হযরত ইবরাহীমের পবিত্র মাজারে বসিয়া কৃত প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া আপনার দরবার পর্য্যন্ত আসার ব্যাপারে আন্তরিক দ্বিধা অনুভব করিতেছি।

হযরত ইমাম রেযা শহীদের এই পবিত্র শাহাদতগাহে দাঁড়াইয়া বলিতেছি,—হে প্রিয় বৎস! ইসলামের বাদশাহ!! আমার উপদেশ গ্রহণ করুণ, আল্লাহ তা'লা আপনাকে আপনার পিতৃপুরুষগণের গৌরব এবং মর্য্যাদার আসন পর্য্যন্ত নিয়া পৌঁছাইবেন। আখেরাতের জীবনেও হযরত ছুলায়মান আলাইহেস্‌সালামের তুল্য মর্তবা ও মর্য্যাদা দান করিবেন। তিনি যেমন আল্লাহর প্রেরীত পয়গাম্বর ছিলেন, তেমনি বাদশাহও ছিলেন।

আপনি আমাকে সুযোগ দিন, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পবিত্র মাজারে দাঁড়াইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তার মর্য্যাদা যেন রক্ষা করিতে পারি। যে ব্যক্তির অন্তর দুনিয়ার ঝামেলা হইতে সরিয়া আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, তেমন লোকের মনে কষ্ট দিবেন না।

আমি মনে করি, আমার রক্ত মাংসের এই দেহটা আপনার সম্মুখে হাজির করার চাইতে আমার এই কথাগুলি আপনার নিকট অধিকতর পছন্দনীয় এবং কার্য্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমার এই কথা যদি আপনার নিকট গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় তবে ইহাই আমার ব্যাপারে সুবিবেচনা প্রসূত

সিদ্ধান্ত হইবে। আর যদি আপনার পূর্ব সিদ্ধান্তই অটল থাকিয়া যায়, তবে আমার পক্ষে বাদশাহের নির্দেশ অনন্যোপায় হইয়াই পালন করিতে হইবে।

আল্লাহপাক আপনার অন্তর এবং যবানকে হেফাজত করুন যেন হাশরের ময়দানে আপনি লজ্জিত না হন। আপনার কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যাই যেন ইসলামের পক্ষে ক্ষতির কারণ না হয়। আল্লাহর তরফ হইতে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

... ...

জানা যায়, পত্র পাঠ করিয়া সুলতান ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। দরবারীগণকে বলিলেন,—আমার ইচ্ছা, সামনাসামনি কথা বার্তা বলিয়া ইমাম সাহেবের ধ্যান ধারণা এবং আকিদা-বিশ্বাস যাচাই করি।

বিরুদ্ধবাদীগণ এই সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাহাদের আশংকা হইল, সুলতানের সঙ্গে যদি ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটে তবে তিনি হয়ত প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িবেন। এই জন্য তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন যেন ইমাম সাহেব দরবারে না আসিয়া বাহিরেই কোথাও বিরুদ্ধপন্থী আলেমগণের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হন এবং এই ব্যাপারে সরকারী চাপ প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে একবার ইমাম সাহেবকে ধর্মীয় বিতর্কে অবতীর্ণ করিতে পারিলে হয়ত তাঁহাকে সহজে বদনাম করিয়া দেওয়া সহজ হইবে।

তুসের জ্ঞানীগুণীগণ এই ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করিতে পারিয়া বিরুদ্ধবাদীগণের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হইলেন এবং ঘোষণা করিলে যে, আমরা ইমাম সাহেবের শিষ্য-সাগরেদ, আপনারা যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক করিতে চান সেইসব বিষয় প্রথমে আমাদের সম্মুখে পেশ করুন, যদি আমরা সেই সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে না পারি তবেই সেইগুলি ইমাম সাহেবের সম্মুখে পেশ করা হইবে। কারণ, আপনারা যে পর্য্যায়ের আলেম এই পর্য্যায়ের লোকের সঙ্গে ইমাম সাহেবের ন্যায় মহাজ্ঞানীর পক্ষে তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

তুসের আলেমগণ কর্তৃক এই নতুন প্রশ্ন উত্থাপনের ফলে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হইল। সুলতান দেখিলেন, এইরূপে অর্থহীন তর্ক-বিতর্কের ফলে অনর্থক সমাজিক শান্তি বিপন্ন এবং জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ ছড়াইয়া পড়ার উপক্রম হইতে পারে। তাই সরাসরি ইমাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিতর্কমূলক বিষয়াদির মীমাংসা করিয়া নেওয়াই শ্রেয়।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুলতান সনজর উজিরে আজম মুঈনুল-মুলককে নির্দেশ দিলেন যেন ইমাম সাহেবকে সরাসরি দরবারে হাজির করা হয়।

শেষ পর্যন্ত ইমাম সাহেব অনন্যোপায় হইয়া সুলতানের ছাউনীতে আগমণ করিলেন এবং প্রথমে প্রধান উজির মুঈনুল-মূলক এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। মুঈনুল-মুলক অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ইমাম সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুলতানের দরবার পর্যন্ত পৌঁছিলেন।

সুলতান সনজর দাঁড়াইয়া ইমাম সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সিংহাসনের পাশে পূর্ব নির্দ্ধারিত একটি সম্মানজনক আসনে বসাইলেন।

ইমাম সাহেব প্রথম জীবনে অনেকবারই সুলতানগণের জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে যাতায়াত করিয়া দরবার সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তার পরেও সনজরের দরবারের শান-শওকত দেখিয়া কিছুটা হতচকিত হইয়া পড়িলেন। এতদ-সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সুলতানের সম্মুখে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করিয়া সুদীর্ঘ ওয়াজ করিলেন।

ইমাম সাহেবের ওয়াজ

আল্লাহতা'আলার হামদ এবং রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও ছালাম পৌঁছানোর পর; আল্লাহ তা'লা মুসলমান সুলতানগণকে দীর্ঘ-জীবনদান করুণ এবং ছহীছালামতে দ্বীনের খেদমত আনজাম দেওয়ার তওফীক দিন।

বাদশাহ-সুলতানগণের সঙ্গে হাক্কানী আলেমগণের যে যুগসূত্র তা সাধারণতঃ দোয়া, উৎসাহ প্রদান, উপদেশ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার মাধ্যমেই স্থাপিত হইতে পারে।

আমার চিন্তাধারা হইতেছে, দূরে অবস্থান করিয়া রাতের অন্ধকারে গরজহীন অন্তর লইয়া যে দোয়া করা হয়, সেই দোয়া প্রকাশ্য দরবারে অন্যকে দেখাইয়া করার চাইতে অনেক অনেক গুণ শ্রেয়। কেননা, আল্লাহ তা'লার পাক দরবারে আন্তরিক নিষ্ঠা, গভীর হৃদয়াবেগ এবং পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে পেশ করা না হইলে, সেই দোয়া সাধারণতঃ কবুল হয় না।

আমার ন্যায় লোকের পক্ষে আপনার প্রশংসা বা উৎসাহ প্রদানের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। কেননা, উহা সূর্য্যালোকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উহার ঔজ্জল্য সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করার নামান্তর মাত্র। তাই, আমি নছিহতের মাধ্যমে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

নছিহত এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, তার অন্যতম প্রধান পথ নির্দ্দেশক খোদ রছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের ফরমান। তিনি এরশাদ করিয়াছেন ঃ—তোমাদের মধ্যে আমি দুইটি মূর্তিমান উপদেশ রাখিয়া যাইতেছি। একটি সবাক এবং অন্যটি নির্বাক। নির্বাক উপদেষ্টা মৃত্যু এবং সবাক উপদেষ্টা আল্লাহর কিতাব কুরআন।'' (১)

চিন্তা করিয়া দেখুন, নির্বাক ওয়ায়েজ বা উপদেষ্টা তার অমোঘ শক্তির মাধ্যমে এবং সবাক উপদেশদানকারী তার সুস্পষ্ট যবানের দ্বারা আমাদিগকে কি বলিতে চায়?

নির্বাক উপদেশদানকারী মৃত্যু বলিতেছে, এই দুনিয়ার বুকে যত জীবিত মানুষ রহিয়াছে, আমি সবার পিছনে উৎপাতিয়া বসিয়া রহিয়াছি। আমি আমার অবস্থান স্থল হইতে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে হঠাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করি। দূত প্রেরণ করিয়া তোমাদের কাহাকেও পূর্ব প্রস্তুতির কোন সুযোগই দেওয়া হইবে না। আমার কাজ কত দ্রুত, আমার ডাক কত নির্ভুল, তা তোমরা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত আমার কর্মতৎপরতার মধ্যেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে।

---

(১) تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا . الصامت الموت والناطق القران ٥

বাদশাহগণ তাঁহাদের পূর্ববর্তী বাদশাহদিগের এবং আমীরগণ তাঁহাদের আগেকার আমীরগণের অবস্থা সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করিতে পারেন।

সুলতান মালিক শাহ আলপ, আরসালান এবং তুঘরল বেগ কবরের ভিতর হইতে যেন আপনাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—হে আমার উত্তরাধিকারী হে প্রিয় বৎস! প্রজা সাধারণের ব্যাপারে সাবধান হও, আল্লাহর গজব হইতে বাঁচিতে চেষ্টা কর, আল্লাহকে ভয় কর। যদি তোমরা জানিতে পাইতে আমরা কিরূপ সংকট এবং কেমন ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন, তবে বোধহয় তোমরা এক ওয়াক্ত ও পেট ভরিয়া খানা খাইতে বা জমকালো পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে সাহস করিতে না। তোমাদের প্রজাগণের মধ্যে কোন একটি লোকও খাদ্যবস্ত্রে কষ্ট পাইত না। তোমাদের অধিকারে তো বিপুল সম্পদ রহিয়াছে। শেষ বিচারের দিন সেই সম্পদ এবং তোমাদের কার্যকলাপ পাশাপাশি রাখিয়া এই ধনরাসীর এক একটা বিন্দুর ব্যবহার সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে। আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন,—তোমাদের যে কেহ একটি অনুপরিমাণ সৎকাজ করিবে, সে তার প্রতিফল দেখিতে পাইবে এবং যদি কেহ একটি অনুপরিমাণ মন্দকাজ করে, তবে, তার পরিনামও সে দেখিতে পাইবে। (১)

এই জীবনে যা ইচ্ছা হয় করিতে পার তবে স্মরণ রাখিও সেই মহা বিচার দিনে সমস্ত কর্মের প্রতিটি অনু-পরমানুই নিজের চক্ষে দেখিতে পাইবে।

হাদীছ শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে প্রত্যেকটি মৃত ব্যক্তির সম্মুখে প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে তিনটি ভাণ্ডার পেশ করা হয়।

(ক) আল্লাহর রেযামন্দির ভাণ্ডার। বান্দা এবাদত বন্দেগীতে যে সময়টুকু ব্যয় করিয়া গিয়াছে, এই সময়টুকুই উক্ত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আল্লাহর রেযামন্দিতে ভরা এই সময়টুকু দেখার সময় বান্দার মনে এমন অস্বাভাবিক আনন্দ দেখা দেয় যে, সেই আনন্দের মোকাবেলায় আট বেহেশ্তের নেয়ামত

---

(১) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٥

রাশি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কেননা, আল্লাহর আনুগত্যের কি প্রতিফল, তাই এই সময়ে বান্দার সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয়।

(২) দ্বিতীয় একটি ভাণ্ডার পেশ করা হয়, যা একেবারে শূন্যগর্ভ। ইহা সেই সময়টুকু, যে টুকু সে দুনিয়াতে নিদ্রা এবং অন্যান্য মোবাহ কাজকর্মে ব্যয় করিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার অন্তরে এমন আক্ষেপের সৃষ্টি হয়, যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।

(৩) তৃতীয় একটি ভাণ্ডার এমন পেশ করা হয় যা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইহা সেই সময়টুকুর সমষ্টি, যা সে দুনিয়ার জীবনে গোনাহর মধ্যে ব্যয় করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বান্দার অন্তরে এমন ভীতি এবং ত্রাসের সৃষ্টি হয় যে, সে তখন শুধু আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে, হায় হায়! আমি যদি দুনিয়াতে জন্মই না নিতাম!

হে রাজন! আপনি এই দুনিয়ার জীবনে সীমাহীন ধন-দওলত, সৈন্য সামন্ত এবং সাজ সরঞ্জাম সঞ্চয় করিয়াছেন। এই সবের পাশাপাশি আখেরাতের জন্যও কিছু সঞ্চয় করুন। আখেরাতের জীবন এবং তার স্থায়িত্বের কথা একটু চিন্তা করুন। দুনিয়ার জীবন তো হাতে গোনা কয়েকটি দিন মাত্র, তাও আবার একদিন এমন কি একটা শ্বাসের ভরসাও নাই। অপর পক্ষে আখেরাতের জীবনের না কোন শেষ আছে, না কোন সীমা রেখা। এই সাত আছমান-যমিন যদি শষ্যকণা দ্বারা ভরিয়া দিয়া একটি পাখীকে প্রতি হাজার বছর পর পর এক একটি দানা খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে সেই দানা একদিন শেষ হইবে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও আখেরাতের জীবনের একটি মুহূর্তও শেষ হইবে না। সুতরাং এই অনন্ত জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্য কতটুকু প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

মনে রাখিবেন, মহা বিচার দিনে প্রত্যেকটি মানুষকেই দোজখের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, সেই দিনের এক একটি মুহূর্ত হাজার বছরের চাইতেও দীর্ঘতর হইবে। একমাত্র সেই সমস্ত লোকই সুস্থ শান্তভাবে সেই পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে, যাহাদের ঈমান সুস্থ ও সুদৃঢ় থাকিবে। জানিয়া রাখুন ঈমান একটি বৃক্ষ বিশেষ, আল্লাহর আনুগত্যের রস দ্বারাই ইহার প্রবৃদ্ধি সাধন হয়। ন্যায় বিচার হইতেছে সেই বৃক্ষের শিকড়। অবিরাম আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই উহা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায় যদি ঈমান বৃক্ষের পরিচর্য্যা করা না হয়, তবে মৃত্যু যন্ত্রনার ঝাপটাতেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কেননা, যে বৃক্ষের শিকড় মজবুত নয়, ঝড়-ঝাপটার আঘাত সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা উহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

রাজন! আমার একটি উপদেশ গ্রহণ করুন। সর্বদা কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ যবানে জারী রাখিতে চেষ্টা করুন। এমনভাবে তা উচ্চারণ করিতে থাকিবেন যা অন্য কেহ শুনিতে না পায়। আপনি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকুন বা শিকারের জন্য বনে জঙ্গলে অবস্থান করুণ অথবা নিরিবিলিতে বিশ্রামরতই থাকুন এই ওজীফা হইতে যবানকে অবসর দিবেন না। কেননা এই ওজীফা দ্বারা ঈমান মজবুত হয়।

বাদশাহ নামদার! যদি আখেরাতের আজাব হইতে আপনি মুক্তি ও পান তবুও মহাবিচার দিনের কৈফিয়ত প্রদান হইতে কিছুতেই রেহাই পাইবেন না। কেননা, হাদীছশরীফে আসিয়াছে—"তোমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষমতার আওতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।"

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি আপনাকে সেই দিন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমি তো তোমাকে আমার অগণিত বান্দার উপর ক্ষমতাশীল করিয়াছিলাম। তোমাকে কিছু সুন্দর অশ্বও দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তোমার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে শ্যামল তৃণভূমিতে বিচরণরত অশ্বপালের পিছনেই নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলে, আমার বান্দাদিগকে তুমি তোমার সখের ঘোড়াগুলির সমান মর্য্যাদাও দাও নাই। অথচ সেই সব বান্দার মধ্যে আমার কত বিশিষ্ট আবেদ মুখলেছ বান্দাও তো ছিলেন। তাহাদিগকে তুমি একটি অশ্বের সমান মর্য্যাদাও দাও নাই। অথচ আমি বলিয়া দিয়াছিলাম মুমিন বান্দার অন্তর কাবার চাইতেও অধিক মর্য্যাদাশালী। ভাবিয়া দেখুন এইরূপ প্রশ্নের কি জবাব সেই দিন আপনি দিবেন?

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের অবস্থা ছিল এই ঃ—একদিন এক দরিদ্র ব্যক্তির একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল। খবর পাইয়া হযরত ওমর (রাঃ) অন্ধকার রাত্রিতে খালিপায়ে গলীতে গলীতে ঘুরিয়া সেই উটটি তালাশ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন "যদি লোম উঠা তুচ্ছ একটি ছাগলছানার খুঁজ-খবর নেওয়ার

দায়িত্ব পালন করিতে যাইয়াও আমার দ্বারা ক্রটি হইয়া যায়, তবে সেই সম্পর্কেও আমাকে অবশ্যই জবাবদীহি করিতে হইবে।"

জনৈক ছাহাবী বার বৎসর পর হযরত ওমরকে (রাঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, দেখিতে পাইলেন, গোসল করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করিয়াছেন। যেন কঠিন কোন কাজ শেষ করিয়া অবসর পাইয়াছেন।

ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন—আমিরুল মোমেনীন! আল্লাহপাক আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? বলিলেন, দুনিয়া হইতে আমার বিদায় হওয়ার পর কত বৎসর কাটিয়াছে?

ছাহাবী জবাব দিলেন, বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বলিলেন, এই পর্য্যন্ত আমাকে জবাবদিহী করিয়া কাটাইতে হইয়াছে। যদি আল্লাহপাক অত্যন্ত মেহেরবান দয়ালু না হইতেন তবে আমার জবাব দেহীর কাজ অত্যন্ত কঠিন হইত।

মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সুবিচারক শাসকের ব্যাপার যদি এইরূপ হয় তবে সেই অনুপাতে আপনি আপনার দায়িত্ব ও পরিনতির কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

অনেক রাজা-বাদশার সম্মুখেই আমি সুদীর্ঘ ওয়াজ করিয়াছি। আপনাকে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি জরুরী কথা বলিতে চাই। আমার গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী সম্বলিত একটি লিখিত পুস্তিকাও আপনার সম্মুখে পেশ করিতে ইচ্ছা রাখি। উহাতে আপনি আপনার মহান পিতা মালেক শাহের চরিত্রের সম্যক পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।

আপনার পিতা যেভাবে প্রজাপালন করিতেন, আপনি সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। দায়িত্বশীল কর্মচারীগণ যদি এমন কোন পরামর্শ দেয় যে আপনার পিতা যে শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে দশ দেরহাম রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, আপনি সহজেই আজ তাহাদের নিকট হইতে দশদীনার আদায় করিতে পারেন, তবে সেইরূপ পরামর্শ কখনও কবুল করিবেন না। আপনি বরং তাহাদিগকে বলিবেন, "আমার পিতা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিতেন আমি কি আল্লাহর ভয় হইতে দূরে সরিয়া পড়িব? আমার পিতা বুদ্ধিমান ছিলেন, তাহার নীতির খেলাফ করিয়া আমি কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিব? তিনি সুনাম এবং প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, আমাকে কি তোমরা সেই ভক্তি শ্রদ্ধার আসন হইতে বিচ্যুত করিতে চাও"।

পরামর্শ দাতারা যদি কোন একজন জ্ঞানী লোক সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য দেয় যে এই লোকটি আল্লাহ মানে না, ইহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিন, তবে শুধু ইহাদের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়াই সেইরূপ কোন নির্দেশ দিবেন না। বরং খুঁজ খবর নিবেন, জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার পিতার আমলদারীতে সেই লোক কোথায় ছিল তার মতামত সম্পর্কে কোন কথা উঠিয়াছিল কিনা। সর্বোপরি সরাসরিভাবে তার মুখ বা কলমের মাধ্যমে এরূপ কোন কথা বাহির হইয়াছে কি না!

সর্বদা স্মরণ রাখিবেন, আপনার মহান পিতা ন্যায়বিচার এবং সুশাসনের যে সুদৃঢ় ইমারত গড়িয়া গিয়াছেন, শুধু মন্ত্রণাদাতাদের মুখের কথাতেই সেই মর্য্যাদার ইমারতটি ধ্বসাইয়া দিবেন না। পিতার সুবিচার পূর্ণ শাসনব্যবস্থা ধ্বসাইয়া দিয়া তদস্থানে অবিবেচনা প্রসুত কিছু করিয়া বসার পরিণাম মঙ্গলজনক হইবে না। আখেরাতেও এর দ্বারা শুধু অমঙ্গলই ডাকিয়া আনা হইবে।

হে বাদশাহ! আল্লাহ তালার নেয়ামত সমুহের শুকরিয়া আদায় করুণ এই দুনিয়ায় নেয়ামত সাধারণতঃ চারি ধরণের হইয়া থাকে। যথা—আল্লাহর প্রতি ঈমান, ছহীহ্ এতেকাদ, বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠব এবং মনোরম চরিত্র মাধুর্য্য। প্রথম তিনটি নেয়ামত অবশ্য আল্লাহ তা'লার দান, তবে শেষোক্তটি সম্পুর্ণরূপেই আপনার এখতিয়ারাধীন। আল্লাহতা'লা যখন তাঁর তরফ হইতে প্রমমোক্ত তিনটি নেয়ামত উদার হস্তেই আপনাকে দান করিয়াছেন, তখন শেষোক্ত নেয়ামতটি অর্জ্জন করার জন্য যে কোন চেষ্টা সাধনায় অবতীর্ণ হওয়ার পথে পিছপা হওয়া কি আপনার পক্ষে সমিচীন হইবে?

হুকুমতের আমিরগণের প্রতি আমার উপদেশ ঃ—যদি তোমরা আন্তরিকভাবে কামনা কর যে, হুকুমতের ভিত্তি সুদৃঢ় হউক, শান্তিপূর্ণ হউক তবে তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ তালার নেয়ামত সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনিত হওয়া এবং তার যথার্থ কদর করা। স্মরণ রাখিও তোমাদের বাদশাহ

একজন নয়, দুইজন। একজনতো চোখের সম্মুখে এই খোরাসান অধিপতি, অন্যজন হইতেছেন এই আছমান জমিন সহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের বাদশাহ, তিনিই তোমাদের এবং সকলের প্রকৃত বাদশাহ। কাল হাশরের ময়দানে তোমাদের নিকট তিনি কৈফিয়ত তলব করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন,—তোমাদিগকে আমি ক্ষমতারূপ যে নেয়ামত দান করিয়াছিলাম, তাহা তোমরা কিভাবে ব্যবহার করিয়াছ?

মনে রাখিও, শাসন কর্তৃপক্ষের স্কন্ধে আল্লাহর তরফ হইতে ভাণ্ডারের আমানত স্বরূপ। দুনিয়াবাসীগণের উপর সুখ দুঃখ যা আসে তার অধিকাংশই আসিয়া থাকে শাসন কতৃপক্ষের মাধ্যমে। তাহাদেরই মন মস্তকের দ্বারা মানুষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'লা জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমি আমার অফুরন্ত রত্ন ভাণ্ডার তোমাদের উপর ন্যাস্ত করিয়া ছিলাম। তোমাদের যবানকে তার চাবীতে পরিণত করিয়াছিলাম। সেই আমানত কি তোমরা যথাযথ ভাবে হেফাজত করিয়াছিলে, না তার মধ্যে খেয়ানত করিয়াছিলে? তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি কোন মজলুমের অবস্থা বাদশাহর নিকট হইতে গোপন করিবে, তার সেই কাজ আমানতে খেয়ানত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। যদি তোমরা আল্লাহর আজাব-গজব হইতে বাঁচিতে চাও, তবে আমার এই নছিহত খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং এই অনুযায়ী আমল করিতে চেষ্টা কর।"

মাননীয় সুলতান! সর্বশেষে আমি আপনাকে আরও কয়েকটি কথা বলিতে চাই। তন্মধ্যে পত্রে আমি তুস্ এলাকার সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ছিলাম। পর্য্যায়ক্রমিক নির্মম শোষণে আজ উহারা অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়া অবাক হই, উপর্য্যুপরি করভারে যখন গরীব মুসলমানদের গর্দান ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে তখন আপনার আস্তাবলের শখের ঘোড়াগুলির গলদেশ ভরিয়া উঠিতেছে সোনা-চাঁদির গলাবন্দের জৌলুসে!

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হইতেছে এই যে, গত বার বৎসর ধরিয়া আমি সংসার জীবনের সকল কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছি। ইতিমধ্যে উজির ফখরুল-মূলক আমাকে বার বার নিশাপুর আসার জন্য

তাকিদ করিয়াছেন। প্রত্যেক বারই আমি তাঁহাকে জবাব দিয়াছি যে, বর্তমান যমানা আমার কথার উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে না। এখন কেহ যদি কোন হক কথা প্রকাশ করেন তবে লোকে দলবদ্ধভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করিতে শুরু করে।

ফখরুল-মূলক আমাকে বারবার বলিয়াছেন যে, বর্তমান বাদশাহ্ নেহায়েত সুবিবেচক। এতদসত্বেও আপনার কোন কথায় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইলে আমি স্বয়ং তার মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এখানে আসার পর, আপনার আশপাশে যে সমস্ত লোক ভীড় করিয়া আছে, উহাদের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া আমি নিরাশ হইয়াছি। এইরূপ ব্যাপার স্বপ্নে দেখিলে বোধ হয় আমি তা দুঃস্বপ্ন বলিয়া ভুলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতাম।

যে সমস্ত বিষয় যুক্তি নির্ভর সেই সমস্ত বিষয়ে আমার মতামত সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কোন মতান্তর হইলে কোন কথা ছিল না। কারণ, আমি এমন অনেক জটিল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যাহা সাধারণ মোটাবুদ্ধির লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা মোটেও সহজ নয়, অবশ্য আমি জটিল দার্শনিক বিষয়াদিও অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছি। এতদসত্বেও আমার কোন কথার ভুলভ্রান্তি অবস্থিত হইলে তা সংশোধন করিয়া নেওয়া আমার পক্ষে কোন কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমার সম্পর্কে যে সব ভীত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, সেই সম্পর্কে আমার কিই বা বক্তব্য থাকিতে পারে? যেমন ধরা যাক, প্রচার করা হইতেছে যে, আমি ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করিয়া থাকি, ইহা নিছক মিথ্যা এবং আল্লাহর কছম করিয়া বলিতে পারি যে, এই ধরণের অপরাধ আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি ইমাম আবু হানিফাকে উম্মতে মোহাম্মদীর (দঃ) একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, এলমে ফেকার সুক্ষ্ম-তত্বাদিতে তাঁহার প্রজ্ঞাও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। আমার বিশ্বাসের বাহিরে যে সমস্ত লোক কোন কথা বা অপবাদ আমার উপর আরোপ করে অথবা আমার কোন বক্তব্যের কদর্থ করিতে চেষ্টা করে, তারা মিথ্যাবাদী, প্রতারক। এহ্ ইয়াউল উলুম কিভাবে উলামাগণের ফজিলত ও মর্য্যাদার কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইমাম

ছাদেক সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি যেসব কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাই আমার আকিদা। ইমাম আবু হানিফাকে এল্মে ফেকার ক্ষেত্রে অনন্ত প্রতিভার অধিকারী হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, মান্য করি।

আমার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইতেছে অপপ্রচারকারীদের ঘৃণ্য কারসাজীর স্বরূপ উদ্ঘাটন। অতঃপর আমার আবেদন, আমাকে নিশাপুর, তুস অথবা অন্য কোন শহরে গিয়া শিক্ষকতার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য যেন পীড়া পীড়ি করা না হয়। আমি অবশিষ্ট জীবন নিরিবিলিতে কাটাইতে চাই। কারণ, আগেই বলিয়াছি, এই যুগের মনমানসিকতা আমার বক্তব্য হজম করিতে পারিবে না।

সুলতানের জবাব ঃ

ইমাম সাহেবের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সুলতান সন্জর মুগ্ধ হইলেন, মন্তব্য করিলেন,—আজ ইরাক এবং খোরাসানের সমস্ত আলেম-উলামাগণ এইখানে উপস্থিত থাকিলে আপনার এই মূল্যবান বক্তব্য শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে আপনার মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিতেন। যা হউক, আপনি আজকের এই বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি পুস্তিকা লিখিয়া আমার নিকট পেশ করুন, উহা দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করার ব্যবস্থা করিয়া আমরা আপনার সম্পর্কে প্রচারিত ভুল ধারণার অপনোদন করিব। এতদসঙ্গে আলেম ও সাধকগণের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আমি কতটুকু শ্রদ্ধা পোষণ করি, সেই সম্পর্কেও সাধারণ মানুষ সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ পাইবে।

আপনাকে শিক্ষকতার দায়িত্ব অবশ্যই পালন করিতে হইবে। আমি এই মর্মে নির্দেশ জারি করিতে চাই, যেন দেশের আলেম-উলামাগণ অন্ততঃ বৎসরে একবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার খেদমতে আসিয়া হাজির হন এবং আপনার কোন বক্তব্য বুঝবার ব্যাপারে যদি কোন দ্বিধা বা সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে যেন সামনা-সামনি আলোচনার মধ্যমে তাহা ফয়সালা করিয়া নেওয়ার সুযোগ পান।"

আলোচনা শেষে ইমাম সাহেব সুলতানের ছাউনী হইতে বাহির হইয়া শহরে প্রবেশ করিলেন। শহরের সর্ব-শ্রেণীর লোক পথে বাহির হইয়া অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে ইমাম সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। সমগ্র শহর যেন উৎসবমুখর হইয়া উঠিল। পথে পথে হাজার হাজার মানুষ বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী তাঁহার যাত্রাপথে স্তুপিকৃত করিয়া রাখিল।

শহরে পেঁাছিয়াই ইমাম সাহেব তাঁহার বক্তব্য লিখিত আকারে সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুলতান পুনরায় ইমাম সাহেবের সেই লিখিত ভাষণ পড়াইয়া শুনিলেন।

কিছুদিন পর সুলতান শিকারে গেলেন। একটি শিকার উপহার স্বরূপ ইমাম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুলতানের এহেন অনাবিল শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জবাবে ইমাম সাহেব সুবিচার, প্রজা বৎসলতা এবং সৎকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিত "নছিহতুল-মুলুক" অর্থাৎ 'রাষ্ট্রপতিগণের প্রতি উপদেশ' নামক কিতাবখানা নিজহাতে লিখিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইলেন।

ইমাম সাহেবের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন

সুলতান সনজর কর্তৃক ইমাম সাহেবের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিরুদ্ধবাদীগণ কিছুটা নিরাশ হইয়া পড়িলেও একেবারে অবদমিত হইল না। ইমাম সাহেব সসম্মানে তুসে ফিরিয়া আসার পর একদিন কয়েক ব্যক্তি তাঁহার খানকায় হাজির হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ইমাম সাহেব বলিলেন,—আমি দর্শন এবং যুক্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব পথের অনুসারী। শাশ্বতঃ সত্য হিসাবে কোরআন আমার পথপ্রদর্শক। ফেকার ক্ষেত্রে আমি কোন ইমামের মুকাল্লেদ বা অনুসারী নই। ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম শাফী প্রমুখ কাহারও নয়।

উপরোক্ত জবাব শ্রবণ করার পর বিরুদ্ধবাদীরা ইমাম সাহেবের লিখিত কিতাব "মেশ্কাতুল-আনওয়ার" এবং 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' এর কিছু কিছু বিষয়বস্তু, যে গুলি সম্পর্কে তাহাদের আপত্তি ছিল, সেইগুলি প্রশ্নের আকারে লিখিতভাবে তাঁহার সম্মুখে পেশ করে। ইমাম সাহেব সেই সমস্ত প্রশ্নের নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত জবাব লিখিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহাদের আপত্তিগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

(এক) "মেশকাতুল-আনওয়ার",—"কিমিয়ায়ে সাআদাত" গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে,—তওহীদে সাধারণ বিশ্বাস হইল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর প্রতি ঈমান আনা এবং বিশেষ স্তরের তওহীদ বিশ্বাস হইতেছে,—"লা হুয়া ইল্লাহু" অর্থাৎ একমাত্র সেই এক অনন্ত সত্তা ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। —তওহীদকে উপরোক্ত দুই পর্যায়ে বিভক্ত করার অর্থ কি?

(দুই) আল্লাহ তা'লার নূরে হাকিকী বলিতে আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

(তিন) লা—এবং ইল্লা (নাই এবং ব্যতীত) বলিতে আপনি কি বুঝেন?

(চার) "এই দুনিয়ার বুকে মানুষের রুহ সঙ্গিহীন এবং দুনিয়ার পরিবেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিধায় সর্বদা উহা উর্দ্ধজগতের সহিত আকৃষ্ট থাকে"—এই কথা দ্বারা আপনি কি প্রমাণ করিতে চান? এইরূপ বিশ্বাস তো খৃষ্টান এবং ভ্রান্ত দার্শনিকদের।

(পাঁচ) "খোদায়ী কোন ভেদ জানার পর তা প্রকাশ করিয়া দেওয়া কুফুরী,"—এই কথার তাৎপর্য কি? সেই ভেদ যদি যথার্থ হয় তবে তা প্রকাশ করা কুফুরী হইবে কেন? আর যদি সেই ভেদ যথার্থ না হয়, তবে এর সঙ্গে "খোদায়ী ভেদ" শব্দের প্রয়োগ যথার্থ হয় কি করিয়া?

ইমাম সাহেবের জবাব

শরিয়তের জ্ঞানসম্পর্কিত কোন জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সম্মুখে অন্তরের জটিল রোগ পরীক্ষার জন্য পেশ করার নামান্তর। প্রশ্নের জবাব দেওয়ার অর্থ সেই রোগের সুচিকিৎসা করিয়া রোগীকে আরোগ্য করার চেষ্টা করা। যারা অজ্ঞ নিঃসন্দেহে তারা রোগাক্রান্ত, তাহাদের অন্তর মধ্যে রোগ রহিয়াছে। আলেমগণ হইতেছেন অন্তর মধ্যস্থিত রোগের চিকিৎসক। সুতরাং যে সমস্ত আলেম অপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন বা অযোগ্য তাদের পক্ষে অন্যের চিকিৎসা করিতে যাওয়া সমিচীন নয়। এলমে যাঁহারা কামেল তাঁহারাও আবার সব জায়গায় চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা শুধুমাত্র সেইসমস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন যে সমস্ত

রোগীর আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। রোগ যদি হয় পুরাতন এবং মজ্জাগত, আর রোগী যদি হয় নির্বোধ, তবে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পক্ষে বিজ্ঞতার প্রমাণ হইবে রোগীকে সরাসরি বলিয়া দেওয়া যে, এই রোগ চিকিৎসার যোগ্য নয়। এই ধরণের রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মুর্খতাজনিত রোগে আক্রান্ত লোক চারি প্রকার। এর মধ্যে একটিমাত্র শ্রেণীর রোগ চিকিৎসাযোগ্য; অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর লোকের চিকিৎসা করার চেষ্টা একেবারেই পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথম ঃ—ঐ সমস্ত লোক যাহারা হিংসার বশবর্তী হইয়া প্রশ্ন করে। হিংসা এমন একটি জটিল ব্যাধী যার চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই ঐ সমস্ত লোকের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর যত যুক্তিসঙ্গত জবাবই দেওয়া হউক না কেন, এর দ্বারা তাদের হিংসার আগুনই শুধু বর্দ্ধিত হইবে, তাহাদের অন্তরে বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে, এই জন্য এই ধরণের লোকের প্রশ্নের জবাব না দেওয়াই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ। কবির ভাষায় বলিতে গেলে ঃ—

ঃ "সব শত্রুতাই শেষ হওয়ার আশা আছে, কিন্তু হিংসুকের শত্রুতা কোন দিনই শেষ হওয়ার মত নয়।"

এইরূপ পরিস্থিতিতে হিংসুককে তার হিংসা নিয়া থাকার সুযোগ দেওয়া এবং উহাদের শত্রুতার কোন পরওয়া না করিয়া নিজের কাজ করিয়া যাওয়াই বিধেয়। কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে,—"যে সমস্ত লোক আমার স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া দুনিয়ার জীবনের আশা-আকাঙ্খাকেই একমাত্র পরমার্থ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তুমিও উহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নাও। উহাদের জ্ঞানের পরিধিই এই পর্যন্ত। নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদিগার ঐসমস্ত লোক সম্পর্কে উত্তমরূপেই অবগত আছেন, কাহারা তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং কাহারা হেদায়েতের উপর রহিয়াছে।"

হিংসুকে যা কিছুই বলে, তাতে সে তার নিজের ঘরেই অগ্নি সংযোগ করিয়া থাকে। কেননা, হিংসায় নেকীসমূহ এমনভাবে গ্রাস করিয়া ফেলে যেমনভাবে আগুন শুকনা কাঠ ভষ্মিভূত করে। এই জন্য উহারা করুণার পাত্র,—বহছ বিতর্কের যোগ্য ইহারা নয়।

দ্বিতীয় ধরণের রোগী হইতেছে, যাহাদের রোগ বুদ্ধিহীনতা ও মুর্খতা-প্রসুত। এই শ্রেণীর লোকও চিকিৎসার যোগ্য নয়। হযরত ঈসা আলাইহেস্‌সালাম মৃতকে জীবিত করিয়া দেখাইয়াছেন কিন্তু আহাম্মকের চিকিৎসা করিতে পারেন নাই। উহারা এমন লোক, যাহারা দর্শন-বিজ্ঞান কোন দিন না পড়িয়াই এমন সব লোকের কথার মধ্যে আপত্তি উথাপন করিয়া বসে, যাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে সূক্ষ্মতম দার্শনিক আলোচনা এবং দর্শন-বিজ্ঞানের জটিল সব গ্রন্থি উন্মোচন করার সাধনায়! এরা এতটুকু বুঝেনা যে, একজন সাধারণ লোকের অন্তরে যে সমস্ত প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে, সেইসব প্রশ্ন উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরেও উদিত হইয়া থাকিবে! তা ছাড়া ইহাও তো প্রণিধানযোগ্য যে, যেসব কথা একজন জ্ঞানী আলেমের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই, তাহা একজন সাধারণ স্থূলবুদ্ধির লোকের পক্ষে জানা কিরূপে সম্ভব হইল?

মুফাছ্‌ছের, মোহাদ্দেছ, আদীব, ফকীহ্‌ প্রমুখ এলেমের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞগণও অনেক সময় দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান রাখেন না। এমন কি দর্শন চর্চাকারীগণেরও অনেকেই বিষয়ের গভীরতায় পৌঁছিতে পারেন না, ভাসাভাসা জ্ঞান রাখেন মাত্র। সুতরাং দর্শনের সুক্ষ্মতম বিষয়াদিতে যে ক্ষেত্রে উপরোক্ত জ্ঞানীগুনীগণের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হয় না, সেখানে যেসব লোক জ্ঞানের কোন শাখাতেই কোন দক্ষতা রাখেন না, দর্শনের ক্ষেত্রে তাহাদের অর্থহীন সব প্রশ্নের জবাব কেমন করিয়া দেওয়া যায়।

কুরআন শরীফে হযরত মূছা ও হযরত খিজিরের যে ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারে সরাসরি-পথ নির্দেশ পাওয়া যায়। সাধারণের মধ্যে কেহ যদি কোন এতিমের নৌকায় ছিদ্র করিয়া দেয় তবে তাহা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু একই কাজ যদি কোন কামেল আলেমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার উপর আপত্তি করা উচিত হইবে না। কেননা, এতিমের মালের হেফাজত করার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রতিটি লোক যেমন জ্ঞাত তেমনি একজন আলেমও তা জানেন। কিন্তু এতদসত্বেও যখন তিনি সেই নৌকা ছিদ্র করিয়া দেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত

রহিয়াছে, যে সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় ওয়াকেফহাল। সুতরাং স্থুল দৃষ্টিতে এইধরণের কোন কামেল ব্যক্তির কোন আপাতঃ সন্দেহজনক আচরণের সমালোচনা করা উচিত হইবে না। তাঁহার বিশেষ এলেম সম্পর্কেও সন্দেহ পোষন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

আল্লাহ তা'লার রাব্বানী রহস্যমালা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অনেকটা ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও স্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সঙ্গে তুলনীয়। কোন ব্যক্তি যদি ঘরে বসিয়া দুনিয়ার সকল প্রকার এলেম শিক্ষা করিয়া ফেলে কিন্তু দেশ ভ্রমনের কষ্ট স্বীকার করিয়া বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ না হয়, তবে তার পক্ষে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভ্রমণকারীর বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর আপত্তি উথাপন করা যেমন হাস্যকর হইবে, ইহাও তেমনি। ঠিক তেমনি একজন ভ্রমণকারী কোন একটি দেশ দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, তার সেই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করিয়া সেইস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিনের সচেতন বাসিন্দার অভিজ্ঞতার সমালোচনা করাও হইবে অনধিকার চর্চা। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট দেশসম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তার ভাষা ভাষা জ্ঞানের যদি কোথাও বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সেই ব্যক্তির পক্ষে উচিত হইবে নিজের বোধীর স্বল্পতা অনুধাবন করিয়া বিশেষজ্ঞের কথা মানিয়া নেওয়া। এতটুকু বুদ্ধির পরিচয়ও যদি সেই লোক দিতে না পারে তবে সেই ধরণের লোককে উপেক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেয়। এইসব লোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

তৃতীয় শ্রেণীর রোগী হইতেছে,— ঐ সমস্ত লোক, যারা উদ্দিষ্ট মনজিলের তালাশ করিতেছে, সেই মনজিলে পৌছার জন্য তারা পথ প্রদর্শকের তালাশ করিয়া থাকে, কোন বিষয় তাহাদের বুঝে না আসিলে, নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা জনিত বলিয়া মনে করে। অনর্থক বিতর্কে অবতীর্ণ না হইয়া প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করে, কাহারো নিকট প্রশ্ন করিলে তাহা কেবল নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই করে। কিন্তু যাহাদের মেধা দুর্বল, বোধী স্থুল, সুক্ষ্ম কোন বিষয় অনুধাবন করার মত মস্তিষ্কের শক্তি তাহাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

এই ধরণের লোক যদি কোন সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে তবে তাহাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন ঃ— "নবী-রসূলগণকে মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ অনুপাতে বক্তব্য রাখার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" অবশ্য এই কথার অর্থ এই নয় যে, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকজনের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলা যাইবে না, বরং এই কথার অর্থ হইল তাহাদের সঙ্গে এমন ভাষায় এবং এমনসব বিষয়ে কথা-বার্তা বলিতে হইবে, যা তার বুঝের আওতায় আসে। যে সব বিষয় বুঝবার মত শক্তি তার মধ্যে নাই, সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা না করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, এই সমস্ত ব্যাপার তোমাদের বুঝে আসিবে না। সুতরাং এই সব বিষয়ের পিছনে পড়িয়া সময় নষ্ট করিও না। কেননা, কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারনা করা হইলে সেই সম্পর্কে তার মনের সন্দেহ গাঢ়তর হওয়া ছাড়া আর কোন ফায়দা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত এইধরণের লোক সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছে। যথা—

O এবং যেহেতু এই সম্পর্কে তাহারা পথের সন্ধান পায় নাই ; সুতরাং তারা ইহাই বলিবে যে, এই সমস্ত পুরাতন মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়।"—ছুরা আহকাফ

O যে সব বিষয় তারা অনুধাবন করিতে পারে নাই সেইগুলি সরাসরি অস্বীকার করিয়া বসে। অথবা যেসব বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান তাহাদের নিকট পৌছে নাই সেইগুলিও তাহারা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করে।"—ছুরা-ইউনুছ।

চতুর্থ শ্রেনীর রোগী হইতেছে ঐ সমস্ত লোক, যাহারা হেদায়েত তালাশ করে এবং তৎসঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধিও রাখে। সম্পদ ও ক্ষমতার দাপট কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায় তাহারা বিভ্রান্ত নয়। শুধু এই এক শ্রেণীর লোকই চিকিৎসার যোগ্য। আমি এখন যে জবাব দিব, তাহা শুধুমাত্র ঐ একশ্রেণীর লোকের জন্যই দিব। আমার এই জবাব পাওয়ার পর যদি এমন কোন লোকের সাক্ষাৎ পাও, যাহার এই জবাবে তৃপ্তি হইতেছে না, তবে তাহাতে আশ্চার্য্যান্বিত হইও না। কেন না, ঐ সমস্ত লোক হয়ত উপরোল্লেখিত চিকিৎসার অযোগ্য তিন শ্রেণীর মধ্য হইতে কোন এক শ্রেণীর লোক হইয়া থাকিবে। অধিকাংশ লোকেই অবশ্য সেই তিন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত,—চতুর্থ শ্রেণীর লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

তওহীদের তাৎপর্য

তোমাদের প্রশ্ন হইল,—আমার বর্ণনা মতে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং তওহীদের পরিপূর্ণতা অর্জন করার পর সেই বিশ্বাস "লা-হুয়া ইল্লাহু"তে পরিণত হইয়া যায়। ঈমান বা তওহীদের ক্ষেত্রে এই ধরণের শ্রেণী-বিন্যাস বৈধ হয় কিরূপে ?

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'কে সাধারণ মানুষের ঈমান হিসাবে অভিহীত করিয়া দ্বীনের বুনিয়াদি কলেমাকে ছোট করা হইয়াছে, প্রকারান্তরে উহাকে অপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অথচ বিশ্ব-মানবের মুক্তির একমাত্র সনদ এই কলেমা। দুনিয়ার সকল ধর্মমতের মূল ভিত্তিও এই কলেমাই।

দ্বিতীয় কথা হইল,—"লা-হুয়া ইল্লাহু' অর্থের দিক দিয়া একটি পরস্পর বিরোধী উক্তি। সাধারণভাবে অর্থ করিতে গেলে এই কথার অর্থ দাঁড়ায় "নাই তিনি, তিনি ছাড়া"। এইরূপ একটি অসংলগ্ন কথা দ্বারা তওহীদের পরিপূর্ণতা অর্জ্জিত হয় কিরূপে ?"

তোমাদের এই প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য শুন। তোমরা যে বুঝিয়াছ, আমার কথা দ্বারা কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে ত্রুটি নির্দেশ করা হইয়াছে, তোমাদের এই ধারণা ভুল। আমার বক্তব্যের মর্মই তোমরা অনুধাবন করিতে পার নাই।

আমার বক্তব্য ছিল,—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কলেমার স্থুল অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সর্ব শ্রেণীর মুসলমান, ঈমানে পূর্ণ অপূর্ণ এমন কি ইহুদী খৃষ্টান সম্প্রদায় ও মৌলিক ভাবে এই কলেমার অর্থ স্বীকার করে। ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানেরাও সরাসরিভাবে এই কথা বলে না যে, আল্লাহ তা'লা তিনজন। তাহাদের বক্তব্য হইল, মূলে তো আল্লাহ একজনই, তিনটি স্বতন্ত্র গুণে তাঁহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। দেখা যাইতেছে, খৃষ্টানেরা আল্লাহর যাতের মধ্যে একত্ববাদের দাবীদার হওয়া সত্বেও ছেফাতের মধ্যে আসিয়া অংশীবাদী মুশরেকে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

আমি 'লা-হুয়া ইল্লাহু' শব্দের দ্বারা কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র কোন

কলেমা বুঝাইতে চাহি নাই। এই কথার মধ্যে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর মর্মার্থই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। এই শব্দ কয়টি দ্বারা আমি এমন ব্যাপক অর্থবোধক একটি বিষয় বুঝাইতে চাহিয়াছি, যার ব্যাখ্যা অত্যন্ত গভীর, যার মর্মার্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এমন সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি এই কথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যা বিশিষ্ট জ্ঞানীগণ ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সাধারণ বুদ্ধি ও অনুধাবন শক্তি সেই মর্মার্থ অনুধাবন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। কিন্তু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর অর্থ সাধারণ-অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষেরই বোধগম্য হওয়া সম্ভব। সকলেই তা বুঝেন, অনুধাবন করিতে পারেন।

তওহীদের স্তর ভেদ

পূর্ব বর্ণীত আলোচনার মাধ্যমে এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আলোচিত দুইটি কথার দ্বারা একই তওহীদের বিভিন্ন স্তর মাত্র বুঝানো হইয়া থাকে; এই প্রসঙ্গে তোমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, তওহীদের কয়েকটি স্তরবিভেদ রহিয়াছে। প্রথম স্তরটি এমন আটপৌরে যেখানে সকল শ্রেণীর মানুষই পেঁৗছিয়া থাকেন। এই স্তরকে কোন ফলের বাকলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বাকলের ভিতরে আবৃত ফলের এমন আর একটি স্তর থাকে, যা তার আসল মগজ। বাকলে আবৃত মগজের ও আবার সার-নির্য্যাস হইয়া থাকে। আখরুট ফলের সঙ্গে এই স্তর বিভক্তির তুলনা দেওয়া যাক। যেমন, আখরুট ফলের মধ্যে প্রথমে পুরু একটি বাকল থাকে। বাকলের ভিতরে আরও একটি কঠিন বাকল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কঠিন আবরণ বা বাকল ভেদ করিয়া তার ভিতর হইতে আসল মগজ উদ্ধার করা হয়। সেই মগজের মধ্যে আবার লুক্কায়িত থাকে তৈলরূপ আসল উপাদান।

ঠিক এমনি, প্রথম হইতে একের পর এক বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পর তওহীদের পরিপূর্ণতার স্তরে গিয়া পেঁৗছা সম্ভব হয়।

প্রথম স্তর হইতেছে, অন্তরের মধ্যে কোন প্রকার প্রত্যয় সৃষ্টি করা ব্যতীতই মুখে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" উচ্চারণ করা। এইরূপে মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যে মুনাফেকরাও শামিল রহিয়াছে। কলেমার স্বীকৃতি দ্বারা তওহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হইয়া যায়। দুনিয়ার জীবনে একজন মুসলমান হিসাবে যা কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে তা হাছিল হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্মুখে এই কলেমার স্বীকৃতির মাধ্যমে তার জানমালও নিরাপদ থাকে। কিন্তু একীন ছাড়া শুধু মৌখিক স্বীকৃতির দ্বারা ঈমান আসে কিনা, তা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর হইল,—আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় লাভ করার চেষ্টা না করিয়াই অন্যদের অনুকরণে কলেমা উচ্চারণ করা এবং কলেমার অর্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। সাধারণ মুসলমানগণের সকলেই এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গেলে উভয় জাহানেই তার ফল লাভ হইবে, অবশ্য নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁহাদের শিক্ষার অনুবর্তী হওয়াও এই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ বিশ্বাসী লোকেরা মারেফাত-পন্থীগণের সমপর্যায়ের সৌভাগ্যের অধিকারী না হইলেও আখেরাতের জীবনে মুক্তিপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

তৃতীয় স্তর হইল,— এই কলেমার মর্মার্থ যুক্তি-প্রমাণসহ অন্তরের মধ্যে এমন দৃঢ়মূল হইয়া যাইবে যে, কলেমার অনুসারী বাস্তব প্রমাণসহ উহার মর্মার্থের উপর সদা দৃঢ় থাকিতে সমর্থ হইবে। তিন তেরতে উনচল্লিশ হয়, এই সত্য যেমন অঙ্ক জানা প্রত্যেকটি লোকের নিকট অভ্রান্ত সত্য, ঠিক তেমনি যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা অভ্রান্ত সত্য হিসাবে আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস তার অন্তরে দৃঢ়মূল থাকিবে। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়ও হইবে না, যে নিজে অঙ্ক জানেনা, কিন্তু অন্যের নিকট শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছে যে, তিন তেরতে উনচল্লিশ হয়, কম বেশী হয় না।

উপরোক্ত তিন স্তরের মধ্যে মানগত যে তফাৎ তা সহজ ভাবে বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, প্রথম স্তরের লোক শুধু মৌখিক বিশ্বাসী, দ্বিতীয় স্তরের লোক এ'তেকাদ সমৃদ্ধ এবং তৃতীয় স্তরের লোক মারেফাতপন্থী। তবে এই তিন স্তরের কোন শ্রেণীকেই কামেল বলা যাইবে না। কামেল হওয়ার স্তর আরও উর্দ্ধে।

চতুর্থ স্তর হইতেছে,—আল্লাহর মারেফাত লাভ হইয়া যাওয়ার পর তার সমস্ত স্বত্বা আল্লাহ তা'লার অনুগত হইয়া যায়। এক মাবুদ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি সামান্যতম আনুগত্যও আর তার দ্বারা প্রকাশিত হয় না, কোন কিছুর প্রতিই তাহার আর কোন প্রকার আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে না।

যে সব লোক প্রবৃত্তির তাড়নার সম্মুখে অসহায়, প্রবৃত্তিই তাহাদের প্রকৃত মা'বুদ মাওলাতে পরিণত হইয়া যায়। আল্লাহ তা'লাই সরাসরিভাবে এই কথাটি আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। বলা হইয়াছে,—''ঐ লোককে কি তুমি দেখ নাই, যারা তাদের প্রবৃত্তিকেই মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিয়াছে?''

মা'বুদ সেই যার উপাসনা করা হয়, কর্মজীবনে যার গোলামী করা হয়, একমাত্র তাঁরই ধ্যানে সর্বদা মত্ত থাকে। মানুষ যে জিনিষের দাসত্ব করে, যার ধ্যানে সর্বদা নিমগ্ন থাকে তারই গোলাম বা বান্দায় পরিণত হইয়া যায়। যেমন আমরা বলিয়া থাকি,—অমুক প্রবৃত্তির দাস, অমুক পেটের পূজারী ইত্যাদি।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—''দেরহাম ও দীনারের পূজারীরা দুনিয়ার দাসেরা ধ্বংস হউক।'' এই হাদীসে প্রবৃত্তি, উদর এবং ধন-দওলতের ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তিগণকে উপরোক্ত বস্তু সমূহের উপাসক বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেন না, ঐ সমস্ত লোক সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলির পিছনেই মনমস্তিক বাঁধিয়া রাখে। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে,—একমাত্র যে সব লোকের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রনে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্যের অনুবর্তী হইয়া যায় একমাত্র সেই সমস্ত লোকের উচ্চারিত কলেমাই যথার্থ। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, এই স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকেরাই যেমন দ্ব্যর্থহীন, তেমনি যথার্থ আন্তরিকও বটে। এইরূপ না হইলে কলেমার মর্মার্থ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কেননা, কলেমার যথার্থ প্রত্যয়হীন স্বীকৃতি যত নিখুত ভাবেই উচ্চারিত হউক না কেন, অন্তরের প্রত্যয়ের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার দরুণ উচ্চারণকারী মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়।

রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—কলেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি বান্দাকে আল্লাহর আযাব হইতে ক্রমাগত দূরে সরাইয়া নিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত সেই বান্দা দুনিয়ার লোভ লালসাকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য না দিবে। যদি সে কলেমা পাঠ করার পরও দ্বীনের উপর দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'লা এইরূপ কলেমা উচ্চারণকারিকে বলিবেন, ''তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তোমার এই স্বীকৃতি অন্তঃসার শূন্য মিথ্যা ব্যতীত আর কিছু নয়।'' এইরূপ ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে সত্য, কলেমার অর্থও হয়ত সে বুঝে, কিন্তু যেহেতু তার মন-মস্তিষ্ক দুনিয়ার লোভ-লালসা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতির পিছনে নিয়োজিত থাকে এবং সর্ব্বাবস্থায় আল্লাহ তা'লার নির্দেশাবলীর মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে না, সেইহেতু তার সেই দাবী মিথ্যা, অন্তঃসার শূন্য, সে যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায়, মুখে বলে, আল্লাহু আকবার,—ফেরেশতাগণ জবাব দেন,—কেন মিথ্যা বল, যদি তোমার অন্তরে এই প্রত্যয় থাকিত যে, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, মহান, তবে তো তুমি আল্লাহরই আনুগত্য করিতে, শয়তানের অনুসরণ করিতে না। একমাত্র আল্লাহকেই তালাশ করিতে, দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তির পিছনে সর্বশক্তি ব্যয় করিয়া আত্মনিয়োগ করিতে না। যখন সে বলে ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী-ফাতারাছ্‌ ছামাওয়াতে ওয়াল্‌ আরদা, অর্থাৎ আমি আসমান-জমিনের স্রষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি আমার সকল মনোযোগ নিবেদন করিতেছি,—তখন ফেরেশ্‌তাগণ ডাকিয়া বলেন, কেন মিথ্যা বলিতেছ? যদি তুমি তোমার এই স্থুল চেহারাটি আল্লাহর প্রতি রুখ করিতে চাও, তবে তা করিও না। কেননা, আল্লাহ বিশেষ কোন দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। একমাত্র অন্তরের সকল মনোযোগ নিয়োজিত করিয়াই তাঁহার প্রতি রুখ করা সম্ভব। কিন্তু তোমার অন্তর তো পরিপূর্ণরূপে বাঁধা রহিয়াছে দুনিয়ার ধন দওলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং লোভ লালসার জঞ্জালে। যিনি তোমার ভিতরের সকল তথ্যই উত্তমরূপে অবগত এমন মহান সত্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি কোন সাহসে মিথ্যা বলিতেছ?

এইরূপ নামাজী যখন বলে,—ইয়্যাকা না'বুদু, ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তায়ীন,—অর্থাৎ একমাত্র তোমারই আরাধনা করি এবং তোমার প্রতিই বিনীত হই। তখন ফেরেশ্‌তাগণ ডাকিয়া বলেন,—''মিথ্যা, সব মিথ্যা', তুমি টাকা-পয়সার পূজারী, একমাত্র দুনিয়ার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং হীন স্বার্থই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—তুমি সেইসবেরই পূজারী,—একমাত্র আল্লাহর এবাদতের দাবী তোমার মুখে শোভা পায় না।

এমতাবস্থায়, এই ব্যক্তির ঈমান কি সেই ব্যক্তির ঈমানের সমপর্য্যায়ের বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির মুখে তাকওয়া-পরহেজগারীর লাগাম পরাইয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে, আল্লাহ তা'লার ফরমান ও সন্তুষ্টির কাজ ব্যতীত যে কোন কাজই করে না!

জোলাবের মাধ্যমে যেমন মানুষের ভিতরকার সকল দূষিত বস্তু পরিষ্কার হইয়া বাহির হইয়া আসে, তেমনি ঈমান এবং মারেফাতের মাধ্যমে মানুষের অন্তর মধ্যে লুক্কায়িত সকল জঞ্জাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হইয়া আসে। জোলাব লওয়ার পর যদি তদ্বারা কোন কাজ না করে, তবে যেমন স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হয়, তেমনি তওহীদের জোলাব সেবন করার পরও যদি অন্তর সকল প্রকার গায়রুল্লাহর জঞ্জাল হইতে মুক্ত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে জোলাব কার্য্যকরি নয় কিম্বা রোগ অনুমানের তুলনায় অনেক বেশী জটিল।

এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি কলেমা উচ্চারণ করিয়া তদ্বারা অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুর বন্ধন ও সম্পর্ক হইতে পরিপূর্ণরূপে ধুইয়া-মুছিয়া পাকছাফ করিয়া ফেলিয়াছে, তার কলেমা ঐ লোকের বরাবর কি করিয়া হইতে পারে, যে মুখে মুখে কলেমা পাঠ করার পরও তার অন্তরে বহু বন্ধন এবং লোভ লালসার বেড়াজাল পরিপূর্ণরূপে মওজুদ রহিয়া গিয়াছে? উভয়ই যদিও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণকারী, কিন্তু এই দুইজনের ঈমানের মধ্যে আসমান-জমিনের তফাত রহিয়াছে।

তওহিদের পঞ্চম স্তর হইতেছে,—কলেমার জোলাব দ্বারা অন্তরকে পবিত্র করা নয়, সকল প্রকার খাহেশাতের মুখে লাগাম লাগাইয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করাও নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্তর মধ্যে অন্য যাহা কিছু আছে সব কিছু নিস্ত-নাবুদ করিয়া দিয়া এমন এক চরিত্র গড়িয়া তোলা, যার মধ্যে খাহেশাত বা গায়রুল্লাহর অনুসরণ করার মত আর কোন প্রবণতাই অবশিষ্ট না থাকে। তার প্রতিটি চাল চলনই যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। তার জীবন, তার কর্মপ্রচেষ্টা এমন কি প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকে। সে যখন কথা বলে, তখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জ্জনের

উদ্দেশ্যেই বলে, খানা খাইতে হইলেও খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে খায় না, শরীর রক্ষা করিয়া তদ্বারা এবাদত-বন্দেগীর জন্য শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যেই খায়। মলমূত্র ত্যাগ করার সময়ও তার উদ্দেশ্য থাকে, এর দ্বারা মনমস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করতঃ এবাদত-বন্দেগীতে একাগ্রতা বৃদ্ধি করা। সে ঘুমায় এই উদ্দেশ্যে যেন এর দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া এবাদত-বন্দেগীতে নতুন শক্তির সংযোগ হইতে পারে। নিদ্রার বিলাস তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। সে বিবাহ করে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের পবিত্র সুন্নতের উপর আমল করিয়া উম্মতে মোহাম্মদীর বংশ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। প্রবৃত্তির তাড়না চরিতার্থ করা কিংবা নারী সংস্পর্শের স্বাদ অনুভব করার উদ্দেশ্যে কখনও নয়। এক কথায় সেই ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ এমন কি প্রত্যেকটি অভিব্যক্তিই একান্তভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির মধ্যে নিবেদিত থাকে।

উপরোক্ত স্তর এবং ইতিপূর্বেকার চতুর্থ স্তরের মধ্যে বিস্তর তফাৎ রহিয়াছে। কেন না, চতুর্থ স্তরের ঈমানদার ব্যক্তি শাহ্ওয়াত বা প্রবৃত্তির হামলা হইতে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন না, শরিয়তের বিরোধী পন্থাসমূহ হইতে খাহেশাতকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় মাত্র। কিন্তু পঞ্চম স্তরের ঈমান ব্যক্তিকে শাহ্ওয়াত বা প্রবৃত্তির সকল স্পর্শ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়া আসে।

ষষ্ঠ স্তরের ঈমান হইতেছে,—তওহীদের নূর তাহাকে শুধুমাত্র খাহেশাত বা দুনিয়ার সকল আকর্ষণ হইতেই মুক্ত করে না, আখেরাতের সুখ-দুঃখ ভালমন্দ, সবকিছু হইতেও একেবারে বেখবর এবং মোহমুক্ত করিয়া একমাত্র আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেয়। দুনিয়াতে বসবাস করা সত্ত্বেও এই-দুনিয়া সম্পর্কে তার মধ্যে কোন অনুভূতি পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। সকল কিছুর উর্দ্ধে একমাত্র আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সে তাঁরই আনুগত্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দেয়। দুনিয়া-আখেরাতে যা কিছু আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়া তার সকল মনোযোগের কেন্দ্রভূমি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র 'যাতের' মধ্যে গিয়া সমবেত হইয়া যায়। আল্লাহর 'যাত' ছাড়া অন্য সবকিছুর উপস্থিতি পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া যায়। সবকিছু হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া যেমন সে নিজেকে আল্লাহর যা'তের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, তেমনি তার নজর হইতেও অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব

বিলীন হইয়া যায়। আল্লাহর এবং একমাত্র আল্লাহরই অস্তিত্ব সে সবকিছুতে অনুভব করে। হাদীছ শরীফের মর্মানুযায়ী—"বল, একমাত্র আল্লাহ আছেন এবং অন্য যা কিছু আছে সব ছাড়।" (১) এই কথার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া সব কিছু হইতে পৃথক হইয়া যায়। এই অবস্থায় তার 'হাল' হয়—একমাত্র সেই সত্তা ব্যতীত অন্য সব কিছু বিলীয়মান।" (২) এই বাণীর বাস্তব রূপ এই দরজাকে "ফানা ফিত্‌-তাওহীদের" মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া বলে। এই অবস্থায় পৌঁছার পর একমাত্র পরম সত্তা ব্যতীত অন্য সবকিছু, এমনকি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত তার অনুভূতি হইতে বিলীন হইয়া যায়। যারা সেই পর্যন্ত পৌঁছার মত যোগ্যতা রাখে না, তাহাদের ধারণায় মানবীয় শক্তির পক্ষে এই স্তরে পৌঁছা মোটেও সম্ভবপর নয়।

তওহীদের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে হাদীছে কুদ্‌সীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে,—ঃ নফল এবাদতের মাধ্যমে বান্দা ক্রমান্বয়ে আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে আসে যখন আমি তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করি। আর আমি যখন কোন বান্দাকে ভালবাসিতে শুরু করি, তখন আমিই তার কানে পরিণত হই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে; আমিই তাহার চক্ষুতে পরিণত হই, যদ্বারা সে দেখে এবং আমিই তার জিহ্বায় পরিণত হই, যদ্বারা সে কথা বলে। (১) পঞ্চম স্তরের ঈমান ওয়ালাগণ নিজেরা দেখেন, শুনেন বলেন এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন। কিন্তু তাঁরা যা কিছু করেন, সব একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন, নিজের ভালমন্দ বিচার করিয়া কোন কিছুই করেন না।

কিন্তু ষষ্ঠ স্তরের ঈমান ওয়ালাগণ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেমন বেখেয়াল হইয়া যান, তেমনি তাঁহাদের দেখা, শোনা এবং বলা সবকিছুই নিজেদের

---

(১) قل الله ثم ذرهم -

(২) كل شئ هالك الا وجهه -

(১) لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به ٥

এখতিয়ারের বহির্ভূত হইয়া আল্লাহর তরফ হইতে তা সম্পন্ন হইতে থাকে। সর্বত্র এবং সবকিছুতেই তাঁহারা একমাত্র সত্তাকেই বিরাজমান দেখিতে পান।

প্রথমোক্তগণ সবকিছু দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর মধ্যে এক আল্লাহর তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু শেষোক্তগণের বক্তব্য হইল,—যেখানে যা কিছু দেখি একমাত্র সেই পরম সত্তাকেই দেখি, অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই আর নজরে পড়ে না। (১) প্রথমোক্তগণ বলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই,—শেষোক্তগণ বলেন,—আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই মওজুদ নাই। যাঁরা শেষোক্ত স্তরে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হন, তাহাদিগকে যেহেতু প্রথমোক্ত সবগুলি স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, সেইহেতু তাঁহাদের তুলনায় প্রথমোক্ত সবগুলি স্তরের ঈমানওয়ালাগণ তওহীদের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে আনাড়ি হিসাবে চিহ্নিত হইতে বাধ্য।

ষষ্ঠ স্তরে যাঁহারা পৌঁছেন তাঁহারা সাধারণতঃ বাহ্য জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পতিত হইয়া যান। এই অবস্থায়ও সাধারণতঃ তাঁহারা দুই ধরণের ভুল করিয়া বসেন। কেহ কেহ মনে করেন, পরম সত্তার সঙ্গে তাঁহারা পরিপূর্ণরূপে একাত্ম একীভূত হইয়া গিয়াছেন, এমনকি নিজেরাই সেই সত্তায় পরিণত হইয়া গিয়াছেন, আল্লাহ এবং বান্দার সকল পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় এক শ্রেণীর মধ্যে এমন এক ধরণের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে একীভূত হইয়া যাওয়া তো সম্ভব নয়, তবে পরম সত্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এই পরিস্থিতিতেই তাঁহাদের যবান হইতে বে-এখতেয়ারী অবস্থায় বাহির হইয়া আসে যে,—"আমিই পরম সত্তা-আনাল্‌ হাক্ক।' কিন্তু এই বে-এখতেয়ারীর স্তর অতিক্রম করিয়া যদি তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারেন, তবেই তাঁর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া যায় যে,—যা তার যবান হইতে বাহির হইয়াছে, তা যথার্থ নয়। কারণ, আল্লাহতা'লা কোন রক্ত-মাংসের শরীরে যেমন প্রবেশ করেন না, তেমনি এই দুনিয়ার কোন জড় দেহের সঙ্গে একীভূত হওয়ার কথাও তাঁর জন্য ভাবা যায় না। এই ধরণের কথা বা অনুভূতি তওহীদের চরম স্তরে অগ্রসরমান সাধক

---

(১) ما ارى الا الله وليس فى الوجود غير الله -

গণের সাময়িক একটা অনুভূতি মাত্র। যে অনুভূতি সাধক অন্তরে স্থায়ী হয় না। আর একটু অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়।

মোট কথা হইল, যারা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদের অস্তিত্ব অনুভব করেন না, তাঁহাদের তুলনায়, যাঁরা এক পরম সত্বা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই অনুভব করেন না, তাঁহাদের দরজা তওহীদের ক্ষেত্রে অনেক উর্দ্ধে এবং এই দরজাই চরম সাফল্যের দরজা, পরম পাওয়ার স্তর। এই স্তরেই তওহীদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, মা'বুদ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি লাভ হয়।

একটি প্রশ্ন

আপনি বলিয়াছেন, এক পরম সত্বা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই—ইহা উদ্ভট কথা। কেননা, আসমান, যমিন, গ্রহ নক্ষত্র, ফেরেশতা, শয়তান এই সবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে, এই সত্য কোন বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন মানুষই অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং আপনার উপরোক্ত কথা কি করিয়া যুক্তিগ্রাহ্য হইবে?

জবাব

মনে কর, ঈদের দিনে কোন বাদশাহ লাও-লস্কর, দাস-আমলার এক বিরাট দল সঙ্গে নিয়া ময়দানে চলিয়াছেন। সঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষকেই তাঁর সাজ সজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাহন, পোষাক, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি দিয়া সাজাইয়া আনিয়াছেন। এখন কোন দর্শক যদি এই দৃশ্য দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই লোকগুলি প্রত্যেকেই সমমর্য্যাদাসম্পন্ন সমান সম্পদশালী, তবে তার সেই অনুমান ভুল হইবে না কি? অবশ্য বাদশাহ সম্পর্কে যাহার কোন ধারণাই নাই তাহার পক্ষে এইরূপ ধারনায় উপনীত হওয়া বা এইরূপ মন্তব্য করা মিথ্যা হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বাদশাহ সম্পর্কে ধারণা রাখেন এবং জানেন যে, সঙ্গীয় লোকগুলির সাজ-পোষাক, বাহন এবং ঠাট-বাট সব কিছুই আজ ঈদের দিনের জন্য স্বয়ং বাদশাহর তরফ হইতে দেওয়া হইয়াছে, ঈদের জামাত হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা খুলিয়া নেওয়া হইবে, এই তথ্য জানার পর যদি সেই ব্যক্তি মন্তব্য করে যে, একমাত্র বাদশাহই সকল সাজ-সরঞ্জামের মালিক, সকল জাক-জমক একমাত্র বাদশাহর,—অবশিষ্ট সবকিছুই সাময়িক, গোলামের সাজসজ্জা অস্তিত্বহীন, তবে তার সেই মন্তব্যই কি প্রকৃত তথ্য-নির্ভর হইবে না? এই সমস্ত অধীন দরিদ্র লোককে সাময়িকভাবে সাজাইয়া কৃত্রিম ধনীতে পরিণত করা হইয়াছিল মাত্র, বাদশাহর দেওয়া সাজ-পোষাকে কিছুসময়ের জন্য তাদের গায়ে ধনাঢ্যের চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল মাত্র, কিন্তু এই সাময়িক সাজ-পোষাকে তাহাদের দারিদ্র দূর হইয়া যায় নাই,—গোলামীর অভিশাপ হইতেও তাহারা মুক্তি পায় নাই। অধিকন্ত সাজ-পোষাক গুলি গোলাম-নফরদের গায়ে শোভা পাইলেও এইগুলি ছিল বাদশাহর ঠাট-বাট এবং পোষাক পরিচ্ছদেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বতন্ত্রক্ষেত্রে এইগুলি ব্যবহৃত হয় নাই।

উপরোক্ত নজীরের আলোকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যদি একটু ধ্যান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সৃষ্টির যা কিছু আমাদের চোখে পড়িতেছে, তার সবকিছুই সাময়িক, মৌল অস্তিত্বসম্পন্ন কোন কিছুই সৃষ্টি জগতে নাই। বরং যা কিছু আছে, সবই এক আল্লাহর তরফ হইতে আসিয়াছে, তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। একমাত্র আল্লাহর স্বত্বাই স্থায়ী এবং চিরন্তন, অন্য সবকিছু সাময়িকভাবে তাঁহারই তরফ হইতে তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের প্রকাশ হিসাবে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, আবার সবকিছুই তাঁহারই নির্দেশে বিলীন হইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির জানা নাই যে এই সব কিছুই সাময়িক, কৃত্রিম, তাহার দৃষ্টিতে এইসবের অস্তিত্ব অবশ্যই বাস্তব। কিন্তু যাহারা সৃষ্টি জগত সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল যে,—"একমাত্র তাঁহার মহান সত্বা ব্যতীত অন্য সবকিছুই ধ্বংসশীল"—(১) তাঁহাদের দৃষ্টিতে একমাত্র তাঁহার সেই স্বত্বার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্যসব অস্তিত্ববিহীন বলিয়া প্রতিয়মান হওয়াই স্বাভাবিক।

তা ছাড়া যেহেতু সব বস্তুর অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অস্তিত্বের সহিত সম্পৃক্ত, এবং তাঁহারই এক বিন্দু ইচ্ছার মাধ্যমে অস্তিত্ববান সুতরাং এই সবকিছুরই অস্তিত্ব পরোক্ষ,—প্রত্যক্ষ নয়। সেমতে এই তথ্যের আলোকে যদি কেহ বলেন যে, একমাত্র রাব্বুল-আলামীন ব্যতীত আর

(১) كل شيء هالك إلا وجهه -

কিছুই মওজুদ নাই, তবে তাঁর সেই কথা ভুল হইবে কেন? এমতাবস্থায় 'লা হুয়া ইল্লা হু' বলা শুধু ছহীই নয়, যথার্থ হইবে। এখানে 'হু' শব্দের দ্বারা অস্তিত্ববান সবকিছুর প্রতি ইশারা করা হইতেছে। যদি কেহ এইরূপ প্রত্যয় রাখে যে, এক মহাসত্বা আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হাকিকী বা মৌলিক সত্বার অস্তিত্ব রহিয়াছে, তবে তার পক্ষে লা হুয়া ইল্লা হু বলা দুরস্ত না হইতে পারে, কিন্তু যার বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'লার মহাসত্বা ব্যতীত আর যা কিছু চর্মচক্ষে দেখা যায়, সবকিছুই গৌণ অস্তিত্ব সম্পন্ন, একমাত্র সত্বা আল্লাহর ইচ্ছার উপর এইগুলি টিকিয়া আছে এবং তাঁহার ইচ্ছার মাধ্যমেই একদিন সবকিছু বিলীন হইয়া যাইবে, তবে তার পক্ষে 'লা-হুয়া ইল্লাহু বলাই তৌহিদের শেষ মন্‌যিল সম্পর্কে যথার্থ স্বীকৃতি হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল, এক আল্লাহর অস্তিত্বে প্রত্যয় সুদৃঢ় হওয়ায় এই শেষ মন্‌যিল সম্পর্কে যদি কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হয়, তবে তার সেই না বুঝার কোন চিকিৎসা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কারণ, সূক্ষ্ম বিষয়াদি সব লোকের পক্ষে অনুধাবনযোগ্য হয় না।

নূরে-হাকিকী বলিতে কি বুঝায়?

আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে ঃ—

আল্লাহ, তিনিই নূর, (১)—এই কথা দ্বারা আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? নূর বলিতে আমরা যা বুঝি তা হইল, যে বস্তুর মধ্যে আলো রহিয়াছে এবং যার মধ্যে শিখাও দেখা যায়, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে কি এই কথা খাটে।

জবাব—আমি আমার কিতাবের মধ্যে নূর শব্দের তাৎপর্য ও নুরের স্বরূপ এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি, যে বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই সবকিছু সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে।

নূর বলিতে শুধুমাত্র শিখাযুক্ত আলোকেই বুঝায় না। যদি তাহাই হইত, তবে স্বয়ং আল্লাহ, তাঁহার রছুল (দঃ) এবং কোরআন মজীদ নূর

(১) الله هو النور -

শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত হইত না। (১) কেন না, কুরআন বা রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম তো শিখাযুক্ত কোন আলো নন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, নূরে-হাকিকী বা আল্লাহর নূর আমাদের সাধারণ দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোর সমপর্য্যায়ের কোন কিছু নয়। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ।

দৃষ্টিশক্তির জন্য আলোর প্রয়োজন, কিন্তু সেই আলো দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু নয়। তেমনি অন্তরের জন্যও আলোর প্রয়োজন, যে আলোর মাধ্যমে সবকিছু অনুধাবন করা হয়। অন্তরের কোন বাহ্যিক চক্ষু নাই। তাই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির জন্য যে আলোর প্রয়োজন, অন্তরদৃষ্টির জন্য সেই আলো প্রযোজ্য নয়। এই জন্যই বুদ্ধিকে অন্তরের নূর নামে অভিহীত করা হয়।

কুরআন এবং আল্লাহর রছুল যেহেতু মানুষের বোধী এবং অনুভূতির জগতে পথপ্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেইজন্য এতদুভয়কেও নুর বলা হইয়াছে।

বাহ্যিক নুর বা জ্যোতির তবুও একটা রূপ আছে কিন্তু যে জ্যোতি অন্তর জগতকে পথ দেখায়, তার কোন স্বরূপ নাই। কিন্তু সকলেই তা অনুধাবন করেন। বুদ্ধি মানুষ অনুভব করে, বুদ্ধির দ্বারা অনেক কিছু অনুধাবন করা হয়; কিন্তু বুদ্ধির কোন রূপ নাই। বুদ্ধিকে কেহ কোনদিন দেখে না। তেমনি অন্তর চক্ষুর জ্যোতি আল্লাহর নুরকে দেখা যায় না, কিন্তু তা বাস্তব, অন্তর জগতের সাধক মাত্রই তা অনুভব করিয়া থাকেন।

দুনিয়াতে যা কিছু আছে, তাকে অনুভব করার, বুঝবার একমাত্র মাধ্যম হইতেছে মানুষের অন্তর জগতের অনুভূতি, সেই অনুভূতির নুরই হাকিকী নুর। যার অন্তর জগত যত তীক্ষ্ণ, সে সেই নুর তত বেশী মোশাহাদা বা অনুভব করিতে সক্ষম। কোরআন-হাদীছে এই দিক লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহর রছুল এবং কুরআনকে নুর শব্দের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে।

আমার লিখিত কিতাব "মেশকাতুল-আনওয়ারের মধ্যে উপরোক্ত দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ তা'লাকে "নুরে-হাকিকী" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইখানে যদি শব্দের প্রতি কোন আপত্তি থাকে, তবে জানা উচিত যে, এই শব্দ কুরআন মজিদে উল্লেখিত হইয়াছে,—"আল্লাহ তা'লাই আসমান-যমিনের নূর।" (২)

(১) وانزلنا عليكم نورا مبينا - (২) الله نور السموت و الارض -

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে,—মে'রাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে ছাহাবায়ে-কেরাম হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে প্রশ্ন করিতে যাইয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন যে,—আপনি কি সেই রজনীতে আল্লাহ তা'লাকে দেখিয়াছেন? জবাব দিয়াছিলেন,—আমি 'নুর' কিরূপে দেখিব ?

'নুর' শব্দ এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে যদি এর পরও কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন এবং উপরে বর্ণিত আমার ব্যাখ্যার কোন পরওয়া না করিয়াই নানা প্রকার সন্দেহ পোষণ করিতে শুরু করেন, তবে বুঝিতে হইবে, এই ধরনের আপত্তি নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত। এমন মূর্খতা,—যার চিকিৎসা নাই।

দুনিয়ার পরিবেশে মানুষের রুহ অপরিচিত কেন ?

প্রশ্ন করা হইয়াছে,—মানুষের আত্মা এই দুনিয়াতে এক অপরিচিত আগন্তুক ; সর্বাবস্থায় সে উর্দ্ধজগতে উড়িয়া যাওয়ার জন্য উন্মুখ থাকে,—এই কথার অর্থ কি? এই ধরণের বিশ্বাস তো নাছারা এবং ভ্রান্ত দার্শনিকেরা প্রকাশ করিয়া থাকে !

এই প্রশ্নের জবাবে তোমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ঈসা রাছুলুল্লাহ—এই কথাটি নাছারাদের, তাই বলিয়াকি কথাটি সত্য নয়? হযরত ঈসা কি আল্লাহর প্রেরীত রাছুল নহেন ?

স্মরণ রাখিও, কোন বাতিলপন্থী লোক যদি হক কথা বলে, তবে বক্তার বাতিলপন্থী হওয়ার কারণেই তা বাতিল প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে না। এইরূপ মনে করা নিতান্ত মূর্খতা যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন একটি অন্যায় কথা একবার উচ্চারণ করার পর আর তার মুখ হইতে কখনও কোন হক কথা বাহির হইবে না, তার মুখ হইতে অতঃপর যা কিছু বাহির হইবে সবই বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রকৃত বুদ্ধিমানগণের রীতি হইল —কথাটি যথার্থ কিনা, তা যাচাই করিয়া দেখা। যেমন হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন,—"তোমরা আল্লাহ তা'লাকে মানুষের মাধ্যমে চিনবার চেষ্টা করিও না, বরং প্রথমে পরম সত্যকে জানবার চেষ্টা কর, তাঁহার সম্পর্কে জানা হইয়া গেলে কারা হকপন্থী তাহাদের পরিচয় স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া যাইবে।"

মানুষের রুহ এই দুনিয়ার পরিবেশে সত্যসত্যই অপরিচিত। তার প্রকৃত ঠিকানা এই দুনিয়ায় নয়, তার আসল ঠিকানা উর্দ্ধজগতে বেহেশ্তের মধ্যে। এই জন্যই তার আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি বেহেশ্তের পরিবেশে তথা উর্দ্ধজগতের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। কুরআন শরীফের পাতায় পাতায় এই সত্যের সমর্থন এবং সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন যদি কোন খৃষ্টান বা ভ্রান্ত দার্শনিক এই একই কথা বলিয়া থাকে, তবে কি এই কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে? কুরআন এবং হাদীছে বরং প্রমাণের মাধ্যমে এই সত্য প্রমাণিত, সুতরাং একই কথা কোন আহলে-বাতিলের মুখ হইতে বাহির হইলেই তাহা বাতিল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইবে না।

কেহ যদি অন্তর্দৃষ্টি একটু প্রসারিত করিয়া আত্মার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে, তবে সে দেখিতে পাইবে যে, রুহের একমাত্র প্রবনতাই হইতেছে মহান পরওয়ারদিগারের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার একাগ্র আকাংখা। সেই মহান সত্বার জ্যোতিই হইল তাহার পক্ষে প্রকৃত শক্তির আধার। অবশ্য দুনিয়ার কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গেও রুহের কিছুটা একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়, তবে তা নিতান্তই গৌণ ; সেই মহা সত্বার সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁহারই প্রতি ধাবিত হওয়া ব্যতীত সে প্রকৃত অর্থে তৃপ্ত হইতে পারে না। মারেফাতে-ইলাহীর অমৃত সুধা পান করিয়াই তার প্রাণ-প্রাচূর্য্য লাভ হয়, এ অমৃতের তালাশেই সতত সে উন্মুখ হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। মারেফাতে ইলাহীর অমৃত সন্ধান করিয়াই তার জীবন-প্রবাহ আবর্তিত হইতেছে এবং সেই মকসুদের পথে অগ্রসরমান অবস্থাই তার প্রকৃত প্রাণবন্ততার লক্ষণ। এহইয়াউল-উলুম এবং কিমিয়ায়ে-সাআদাত কিতাবে রুহের এই অবস্থা এবং চিরন্তন প্রবণতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কেহ যদি এই সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে চায়, তবে তার উচিত সেই দুইটি কিতাব গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা। অপরপক্ষে যদি কেহ নিছক বিদ্বেষ বশতঃই সমালোচনা করিতে শুরু করে, তবে যেহেতু উপরোক্ত দুইটি কিতাবের বিস্তারিত আলোচনা তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই,—এই সামান্য জবাব তার বিদ্বেষতাপে তপ্ত অন্তর শান্ত হইবে বলিয়া আশাকরা যায় না। তাই এই শ্রেণীর আপত্তি

উত্থাপনকারীগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়া বৃথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

অবশ্য যদি কোন প্রকৃত সত্যান্বেষী ব্যক্তি কিতাব পাঠ করিয়া বিষয়টি যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে সমর্থ না হইয়া থাকেন, এবং সত্যাই এই সূক্ষ্ম বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে চান, কিন্তু যথেষ্ট ধীশক্তির অভাবে প্রকৃত সত্যের গভীরতায় পৌঁছিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার পক্ষে উচিত সরাসরি আমার সম্মুখে হাজির হইয়া পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবন করিতে চেষ্টা করা। কেননা, উলামাগণের যবানী যে এলেম হাছিল করা হয়, সেই এলেমই মজবুত এবং যথার্থ হইয়া থাকে। অবশ্য আমি আমার রচিত কিতাবসমূহে এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করিনাই, যা যে কোন বুদ্ধিমান জ্ঞানান্বেষী, এবং যাহাদের অন্তর বিদ্বেষবিষে জর্জ্জরিত নয়, এমন লোকের সম্মুখে প্রমাণসহ ব্যাখা করিতে সমর্থ হই নাই। তবে এমন লোককে আমি কোন দলীল প্রমাণ দ্বারাই বুঝাইতে সমর্থ হইব না, যাহাদের সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে, ঃ—"প্রকৃত সত্য অনুধাবন করা হইতে আমি তাহাদের অন্তরে পর্দা দিয়া রাখিয়াছি। আর তাহাদের শ্রবণশক্তি আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে শক্ত আবরণে, যদি তুমি তাহাদিগকে হেদায়েতের পথে আহবান কর, তবে তাহা কখনও তারা শুনিতে পাইবে না।"—কুরআন।

তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ যে, এই ধরণের জটিল বিষয়গুলি যেন ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়। মনে রাখিও আমার কোন কিতাবেই এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই যা উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি লোকের পক্ষেই এই সমস্ত বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু যে সমস্ত লোক যথাযথ ধীশক্তিসম্পন্ন নয় এবং এই সমস্ত বিষয় পাঠ করিয়াও বুঝে না, তাহাদের সেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে, তারা আমার সম্মুখে আসিয়া যেন প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম বিষয় মীমাংসা করিয়া নেয়। আমার কথাবার্তা শুনিয়া এবং আমার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করিয়া এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা ব্যতীত তাহাদের পক্ষে আর কোন পথ দেখি না।

মূর্খলোক কখন কোন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিবে তা নির্দ্ধারণ করা দুরুহ ব্যাপার। সুতরাং তাহাদের জন্য পূর্ব হইতে কোন জবাব লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। মূর্খতাজনিত বুঝের অভাব, অন্তরের রোগ এবং তার কারণসমূহ বিচিত্রধর্মী। একটির সঙ্গে অপরটির অনেক সময় কোন সম্পর্ক থাকে না। অন্তরের রোগ যে কত প্রকার তা নির্দ্ধারণ করাও সম্ভবপর নয়। সেই দিকে লক্ষ্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। এই ধরণের রোগে আক্রান্তদের ব্যাধী সারাইতে হইলে কুরআন শরীফের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিতে হইবে।

অবশ্য মূর্খদের এতেরাজ সমূহ কুরআন শরীফের দ্বারাও অনেক সময় দূর করা যায় না। ইহাদের অন্তরে অহর্নিশি এমন অসংখ্য শোবা-সন্দেহের উদ্রেক হইতে থাকে যার কোন চিকিৎসা নাই। এদের মনোজগতের সব রোগ সারানোর আশা করাও বৃথা। কেননা,—"যে, ব্যক্তির জিহ্বার স্বাদই বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহার মুখে সুপেয় মিষ্টি পানিও তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়।

রাব্বানী রহস্যাবলী প্রকাশ করার অর্থ কি?

তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, "রবুবিয়তের গুপ্তভেদসমূহ প্রকাশ করিয়া দেওয়া কুফুরী"—আমার উক্ত মন্তব্যের অর্থ কি? ভেদের মধ্যে যদি সত্যতা থাকিয়া থাকে, তবে তা প্রকাশ করাতে যেহেতু কোন প্রকার মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে না, সুতরাং উহা কুফুরী হইবে কেন? আর যদি তা যথার্থ না হয় তবে তাহা রাব্বানী গুপ্তভেদ হইবে কিভাবে?

জবাব—আমার উপরোক্ত মন্তব্যটির অনুরূপ কথা প্রখ্যাত সাধক পণ্ডিত আবুতালেব মক্কীর কুতুল-কুলুব নামক কিতাবেও উল্লেখিত হইয়াছে। তিনি উহা পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক বুযুর্গ হইতে নকল করিয়াছেন। আমি আমার কিতাবে বিষয়টি এইভাবে পরিবেশন করিয়াছি,—"কোন কোন আরেফ বলিয়াছেন যে, রাব্বানী গুপ্তভেদ প্রকাশ করিয়া দেওয়া কুফুরী। কারণ, সেই গুপ্তভেদ সমূহের মধ্যে এমন সব বিষয়েরও অবতারনা রহিয়াছে যা অনেক মানুষেরই বোধী এবং অনুধাবন শক্তির পক্ষে বরদাশ্‌ত করা সম্ভব নয়। এই কারণেই যেসব লোক গুপ্তরহস্য হজম করার মত শক্তি রাখেন না, তাহাদের সম্মুখে

এইসব বিষয়ের অবতারণা করা বিপর্যায়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হাদীছ হইতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এরশাদ করিয়াছেন,—"আমরা নবীগণের জামাতকে মানুষের বোধশক্তি অনুপাতে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।"

আমার বক্তব্যের মধ্যে যেসব রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে তন্মধ্যে তক্‌দীর এবং রুহের কথা ধরা যাইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানী উলামাগণ এই দুইটি বিষয়েরই হাকীকত সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহারা মুখে তা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকেন। কেননা, সাধারণ মানব সমাজের পক্ষে সেই সম্পর্কিত তত্ত্ব অনুধাবনেরও শক্তি নাই। তাই এমন লোকজনের সম্মুখে সেই সব তত্ত্ব কথা প্রকাশ করিতে শুরু করিলে অল্প জ্ঞানসম্পন্ন বহু লোকের পক্ষেই শেরেকী এবং কুফুরীতে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ার ভয় রহিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে—"তক্‌দীর আল্লাহর একটি গুপ্ত রহস্য, তোমরা উহা প্রকাশ করিয়া দিও না।"

গুপ্ত রহস্যাবলী জানা এবং অনুভব করা যায় কিন্তু তা প্রকাশ করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। কারণ উপযুক্ত জ্ঞান এবং অনুভূতিহীন মানুষের পক্ষে এই সমস্ত আলোচনার পিছনে পড়িয়া পদে পদে গোমরাহ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভাসা ভাসা জ্ঞান ও সাধারণ যুক্তির আয়নায় এইসব বিষয় অনুধাবন করার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম মাত্র।

যেমন ধরা যাক, আল্লাহতা'লার স্বরূপ আলোচনা করিতে গিয়া যদি কোন স্থূলবুদ্ধির লোকের মনে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া বসে যে, আল্লাহ কোন দিকে আছেন? রুহ মানুষের শরীরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, কিন্তু শরীরের কোন অংশে তার অবস্থান এই তথ্য যেমন নির্ণয় করা যায় না, তেমনি আল্লাহতা'লা কোন দিকে আছেন, এই দুনিয়ার ভিতরে আছেন না বাহিরে কোথাও, দশদিকের মধ্যে কোন্ দিকে তাঁর অবস্থান, না কি সর্বদিকে তিনি ব্যাপৃত, যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে যাওয়া গোমরাহীর ফাঁদে পা দেওয়ারই নামান্তর মাত্র। কারণ, রুহানিয়াতের জ্ঞান যাহাদের মধ্যে অনুপস্থিত, তাহারা শুধু যুক্তির পিছনে যুক্তি খাড়া করিয়া চলিবে এবং অনুভূতির অভাবে শেষ পর্যন্ত হয়ত আল্লাহর অস্তিত্বকেই

অস্বীকার করিয়া বসিবে। কারণ, স্থূল যুক্তিতে বলে, এই বিশাল সৃষ্টি জগতের মধ্যে যাঁর অবস্থানই নির্ণয় করা যায় না, তাঁর অস্তিত্ব মানা যায় কিরূপে? ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া বসার উপক্রম হয়। এই বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান রছুল মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের অবশ্যই ছিল, কিন্তু তিনি তাহা ছাহাবীগণের সম্মুখে সবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। রুহানীয়াতের জগতে স্থূলযুক্তি সর্বস্বতা কিভাবে মানুষকে গোমরাহীর দিকে ঠেলিয়া নিতে থাকে, তার একটি নজীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এক শ্রেণীর ভ্রান্ত দার্শনিক মনে করে যে, আমাদের এবাদত এবং যিকিরের দ্বারা আল্লাহতা'লা খুসী হন কিংবা গোনাহ করিলে ক্রুদ্ধ হন, এইরূপ ধারণা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেননা, আল্লাহতা'লা এমন এক সত্তা যে কোন অবস্থায় যাঁর কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার ভয় নাই। ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্রোধ সৃষ্টি হয় না। তা ছাড়া কাহারো মধ্যে ক্রোধ তখনই উদ্রেক হইতে পারে যখন অন্য কোন ব্যক্তি তার মর্জির খেলাফ কোন কিছু করিয়া বসে। কিন্তু আল্লাহতা'লা নিজেই যেখানে সবকিছুর প্রকৃত নিয়ন্তা, তাঁর দস্তে-কুদরতের বাহিরে যেখানে অন্য কাহারো অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না, সেখানে কাহার উপর তিনি রাগ করিবেন, তাঁহার সেই রাগ প্রসমিত করার পাত্রই বা হইবে কে?

সন্তুষ্টির ব্যাপারটিও অনেকটা অনুরূপ। অন্যের দ্বারা কাহারো কোন আকাংখা পূর্ণ হওয়ার পর তার অন্তরে খুসীর উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু যাঁর কোন আকাংখাই নাই, আকাংখারূপ ক্ষুদ্রত্ব হইতে যিনি পরিপূর্ণরূপে মুক্ত, তাঁহার পক্ষে খুশী হওয়ার কথা কল্পনা করা কি বৃথা নয়? সর্বোপরি তাঁর ইচ্ছার বাহিরে যখন কোন কিছু হওয়ার মোটেও কোন সম্ভাবনা নাই, তখন নিজের ইচ্ছার প্রতিই খুসী হওয়া অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার।

মোট কথা, রাব্বানী রহস্যাবলী সাধারণ্যে আলোচনার বিষয় নয়, এইগুলি নিছক অনুভব করার বিষয়। সুতরাং এই ব্যাপারে অর্থহীন আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া সাধারণ মানুষের ঈমান বরবাদ করার নামান্তর মাত্র। তাই রুহ, তকদীর প্রভৃতি রহস্যপূর্ণ বিষয়াদির ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ

হওয়ার অনুমতি আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। কারণ, তাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই কুরআন শরীফে রুহ সম্পর্কে খোদা রছুল মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে,—"বলুন, রুহ আমার প্রতি-পালকের একটি রহস্য"—(১) এইটুকুর বাহিরে কিছু বলার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

একই কারণে আমাদের পক্ষেও এর চাইতে বেশী কিছু বলার অধিকার নাই। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোন লোকের নিকটইতো ইহা অবিদিত নয় যে, রুহের হাকীকত সম্পর্কে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। কেননা, রুহের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া কাহারো পক্ষে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা শুধু অত্যন্ত কঠিন ব্যাপারই নয়, অনেকটা অসম্ভবও বটে।

(১) قل الروح من امر ربى -

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

উজিরগণের প্রতি লিখিত পত্রাবলী

উজিরগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ইমাম গাযযালীর মোট বারটি পত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটি নেজামুদ্দিন ফখরুল মুলককে লিখিত, একটি উজীর আহমদ ইবনে নেজামুল মুলকের লিখিত একটি পত্রের জবাব, তিনটি শেহাবুল ইসলামকে ওজারত গ্রহণ করার পূর্বে এবং তিনটি শহীদ মুজিরুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত।

প্রত্যেকটি পত্রই শরিয়তের সুক্ষ্ম জ্ঞান এবং মারেফাতের এক একটি অমূল্য ভাণ্ডার হিসাবে জ্ঞানীগুনী সমাজ কর্তৃক সযতনে রক্ষিত হইয়াছে।

নেজামুদ্দিন ফখরুল মুলককে লিখিত

প্রথম পত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমীর, নেজাম এবং ইত্যাকার যে সমস্ত সম্মান সুচক শব্দ উচ্চপদস্থ লোকদের নামের প্রথমে যুক্ত করা হয়, এই সবই আনুষ্ঠানিক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাদীছ শরীফে আছে ঃ—আমি এবং আমার উম্মতের পরহেজগার লোকেরা সর্বপ্রকার স্থুল আনুষ্ঠানিকতা হইতে মুক্ত। (১)

আমীর শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা এবং তার যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপলব্ধি। যে ব্যক্তির ভিতর এবং বাহির

(১) انا و اتقياء امتى براء من التكلف -

উভয়ই আমীর শব্দের তাৎপর্য্য অনুধাবন জনিত উপলব্ধিতে সজ্জিত. সেই প্রকৃত আমীর; সাধারণ মানুষ এই ধরনের লোককে আমীর শব্দের দ্বারা অভিহিত করুক আর নাই করুক, তাতে কিছু আসে যায় না।

যে সব লোক স্বীয় চরিত্রকে উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত করিতে সক্ষম নয়, সে প্রকৃত পক্ষে আমীর নয়, দুনিয়ার সকল মানুষ তাহাকে আমীর বলিয়া সম্বোধন করিলেও নয়।

যাহার নির্দ্দেশ অধীনদের মধ্যে বিনা বাক্যব্যয়ে কার্য্যকরি হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই আমীর বলা হইয়া থাকে। স্রষ্টিকর্তা তাঁহার অপার কুদরতের হাতে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে সমস্ত মৌলিক শক্তি দান করিয়াছেন, সেইগুলি প্রতিটি মানুষের ভিতরকার ফওজ বিশেষ। এই সমস্ত ফওজ অনেক প্রকারের। বলা হইয়াছে,—"তোমার পরওয়ার দিগারের কত ফওজ রহিয়াছে, তিনি ছাড়া আর কেহ জানে না।" (১)

এই সমস্ত ফওজের মধ্যে নেতৃস্থানীয় তিনটি। তন্মধ্যে প্রথমটি 'কাম'—ইহা মানুষকে অশ্লীলতা এবং ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত করে। দ্বিতীয়টি-'ক্রোধ', ইহা অপরের উপর হামলা, প্রহার এবং হত্যা করিতে উদ্বুদ্ধ করে, তৃতীয়টি হইতেছে 'মোহ', উহাতে লোভ, অন্যায় উচ্চাকাংখা এবং লালসার জন্ম দেয়! ফলে মানুষ নানা প্রকার ধোকা ষড়যন্ত্র এবং অসদাচরণের মধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়। উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে যদি প্রাণীতে রূপান্তর করা যাইত তবে প্রথমটি হইত শুকর দ্বিতীয়টি কুকুর এবং তৃতীয়টি শয়তানের আকৃতি প্রাপ্ত হইত।

মানুষের মধ্যে দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণী হইল যাহারা উপরোক্ত তিনটি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে এবং উহাদের উপর নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার নির্দ্দেশাবলী প্রয়োগ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এই শ্রেণীর লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে আমীর এবং বাদশাহ্‌!

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেছে যাহারা নিজেরাই উপরোক্ত শক্তিগুলির নির্দ্দেশে পরিচালিত, দিবারাত্রি ঐগুলির হুকুম মান্য করার ব্যাপারে সদাব্যস্ত এবং ঐগুলির পরিতৃপ্তির জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত রাখে। এই সমস্ত লোকই

(১) وما يعلم جنود ربك الا هو -

প্রকৃত প্রস্তাবে দাস এবং বন্দী বলিয়া বিবেচিত। যাহারা প্রকৃত বাদশাহগণকে ফকীর মিছকীন বলিয়া অভিহীত করে এবং ইতর দাসপ্রকৃতির লোককে বাদশাহ নামে সম্বোধন করে, এই দুনিয়াতে উহারাই প্রকৃত অন্ধ। উহারা অন্ধকারকে আলো, কাঁটাকে কুসুম এবং মরুভূমিকে কুসুমকুঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করিতে যাইয়া মোটেও লজ্জিত হয় না। অথচ তত্ত্বজ্ঞানী মাত্রই এই সত্য সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, দুনিয়াটা একটা প্রহেলিকা মাত্র, ইহা অন্যএক জাহানের ছায়া ব্যতীত আর কিছু নয়। স্রষ্টিকর্তা দুনিয়াকে দুইভাগে স্রষ্টি করিয়াছেন, একটি তার তাত্বিক দিক, অপরটি উহার ছায়া মাত্র। তাত্বিক দিকটিকে "আলমে হাকীকত" বা আলমে-মালাকুত বলা হয়। দ্বিতীয়টিকে অভিহীত করা হয় আলমে-ছুরত নামে। স্রষ্টি-জগতের যা কিছু আমাদের স্পর্শ ও দৃষ্টির আওতায় রহিয়াছে সেইগুলিই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমরা যা কিছু দেখিয়া থাকি এই সবই প্রহেলিকাবৎ, তাত্বিক অর্থে এইগুলির কোনই অস্তিত্ব নাই, তবে ছুরত আছে, অস্তিত্বের রূপে দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্বেও এই সবই অস্তিত্ববিহীন।

অপরপক্ষে হাকিকতের যে দুনিয়া, উহাই প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পন্ন। প্রকাশ্যতঃ অস্তিত্ব বিহীন হওয়া সত্বেও প্রকৃত অর্থে তাত্বিক দিকটিই আসল এবং অক্ষয়। জীবৎকাল পর্য্যন্ত মানুষের দৃষ্টিশক্তি উহা অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় না। মৃত্যুর মুহূর্তে যখন এই জড় চক্ষু বন্ধ হইয়া যায়, তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে হাকীকতের দুনিয়া উন্মোচিত হইয়া যায়। দুনিয়ার সকল আচরণ তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত হইয়া যাওয়ার পর সে সবকিছু অন্যরকম দেখিতে শুরু করে। এতদিন দুই চক্ষু যেগুলিকে অস্তিত্ববান দেখিত, তখন সেই সমস্তই অস্তিত্বশূন্যরূপে প্রতিয়মান হইতে থাকে। আর, যে সব বিষয়কে অস্তিত্ববিহীন মনে হইত সেই সব দৃষ্টির সম্মুখে বাস্তব রূপে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে,—"পরওয়ারদিগার! ইহা কি দেখিতেছি? সব কিছুই যে, আজ উল্টা মনে হইতেছে!"

জবাব দেওয়া হয় :—"তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সকল পর্দা অপসারিত হইয়াছে। আজই তোমার দৃষ্টি যথার্থ অর্থে তীক্ষ্ণ হইল। (১)

(১) فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ০

বান্দা মিনতি করিয়া বলিবে,—পরওয়ারদিগার, প্রকৃত রহস্যের জগত দেখিলাম, শুনিলাম, এখন আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়া যাইতে দাও যেন সৎকাজ করিয়া আসিতে পারি।" (২)

জবাব দেওয়া হয়,—"আমি কি তোমাকে উপদেশ গ্রহণ করার মত যথেষ্ট হায়াত দেই নাই? তোমাদের নিকট কি আমার তরফ হইতে ভীতি প্রদর্শনকারী পেঁৗছে নাই? আজ তোমার কর্মের প্রতিফল জনিত স্বাদ গ্রহণ কর। জালেমের জন্য আজ আর কোন সাহায্যকারী নাই।" (১)

ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিবেন,—"কোন ধূধূ মরুভূমিকে পিপাসার্ত মানুষ যেমন পানি বলিয়া ভ্রম করে, এবং নিকটে পেঁৗছিয়া কিছুই পায় না, দুনিয়ার জীবন ছিল তোমাদের জন্য তেমনি, আজ একমাত্র আল্লাহকেই নিকটে পাইবে, তিনি সকল হিসাব চুকাইয়া দিবেন। (২)

কেহ প্রশ্ন করিতে পারে—অস্তিত্বরূপী-অস্তিত্বহীনতা এবং অনস্তিত্বরূপী অস্তিত্ব বুঝে আসিল না। দুর্বল বুঝশক্তি সম্পন্নদের জন্য এই কথার তাৎপর্য একটি মিছালের মাধ্যমে পেশ করা হইতেছে—

মনে কর, ঘূর্নীবায়ুর সাহায্যে যে ধুলিবালির কুণ্ডলী সৃষ্টি হয় তা ভূপৃষ্ঠ হইতে একটি ঋজু মিনারের আকৃতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হইতে থাকে। যে কোনদিন উহা দেখে নাই, ইহার তাৎপর্য সম্পর্কে যার পরিপূর্ণ জ্ঞান নাই, প্রথম দর্শনে তার মনে হইবে, ধুলিবালি বোধ হয় আপনা হইতেই ঘুরপ্যাচ খাইয়া এমনভাবে অগ্রসর হইতেছে। বাতাসের সংমিশ্রনে ধুলিকনার এই অবস্থা হইয়াছে, দূর হইতে দেখিয়া তা মনে হইবে না।

বাতাস যেহেতু দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং ধুলিবালিই তার চোখে পড়ে, তাই তার পক্ষে এই তথ্য অনুধাবন করা সহজ হয় না যে, কুণ্ডলীটির

(২) ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا -

(১) اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير - ذوقوا فما للظلمين من نصير o

(২) كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه -

আসল উপকরণ বাতাস, ধুলিকনা নহে। সুতরাং এখানে ধুলিকনা অস্তিত্বের আকারে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন, এবং বাতাস অস্তিত্বহীন রূপেই প্রকৃত অস্তিত্ববান। কেননা ধুলিকনাগুলি নিজের শক্তি বা ইচ্ছায় নয়, বাতাসের শক্তি এবং গতির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া ঘুরপ্যাচ খাইতে বাধ্য হইতেছে। এখানে কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বাতাসের আয়ত্বাধীন, যদিও বাতাসের অস্তিত্বই চোখে পড়িতেছে না।

এর চাইতে আরও ঘনিষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমাদের শরীর এবং রুহের কথা ধরা যাইতে পারে। রুহ অদৃশ্য তাই অস্তিত্ববিহীন রূপে অস্তিত্ববান। রুহের উপর কাহারো কোন কর্তৃত্ব খাটে না, অথচ রুহই হইতেছে মানব দেহের প্রকৃত নিয়ন্ত্রনকারী বাদশাহ্ বিশেষ। দেহ হইল তার আজ্ঞাবহ দাস, অবশ্য রুহ্ যা কিছু দেখে দেহের মাধ্যমেই দেখে, কিন্তু দেহের মধ্যে তার কোন অনুভূতি হয় না।

আরও একটু অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যাইবে, এই দুনিয়া যাঁহার ইশারায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাঁহার সত্বাও উপরোক্ত তত্বের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। সমস্ত মখলুকের বেলায় সমস্ত সৃষ্টিজগতের সেই নিয়ন্তা অস্তিত্বহীন রূপে অস্তিত্ববান রহিয়াছেন। কেননা, সৃষ্টি জগতের কোন একটি অনু-পরমানুও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশিষ্ট নয়, সৃষ্টি কর্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গেই প্রকৃত নিয়ন্তার অস্তিত্বও জ্ঞাতভাবে জড়িত এবং বস্তুর অস্তিত্বের প্রকৃত হাকিকত হিসাবে মওজুদ রহিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিটি অস্তিবান বস্তুর টিকিয়া থাকার ক্ষমতা পরম নিয়ন্তার তরফ হইতেই আহরণ করা হইয়াছে। কুরআনে পাকে এই সত্যটির প্রতি ইশারা করিয়াই বলা হইয়াছে:—যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন।" (১)

এখন যদি কেহ আবার মনে করিয়া বসে যে, তাঁহার "সঙ্গে থাকার" বিষয়টি দৈহিক, দেহের সঙ্গে দেহের সংযোগ, তবে তাহা ভুল করা হইবে। 'সঙ্গে থাকা' শুধুমাত্র দৈহিক অর্থেই নয়, অন্যভাবেও হইতে পারে। অনস্তিত্বরূপ অস্তিত্বের মাধ্যমেই তিনি রহিয়াছেন, সর্বত্র আছেন, সর্বভূতে

(১) انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين -

বিরাজমান অবস্থায় আছেন। যাঁরা সঙ্গে থাকার এই সুক্ষ্ম বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয় তাহারা হয়ত তাঁহাকে তালাশ করিয়া পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস শুরু করে, কিন্তু পরিণামে ব্যর্থতা বরন করা ছাড়া তাহাদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। যারা এই 'সঙ্গ' সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, তাঁহারা তা বাস্তব সত্য হিসাবেই উপলব্ধি করিতে পারেন, স্বতস্ফুর্তভাবেই তাঁহাদের যবান হইতে বাহির হইয়া পড়ে যে,—একজন পরম নিয়ন্ত্রক ব্যতীত কোন কিছুর পক্ষেই অস্তিত্ববান হওয়া সম্ভব নয়। সেই পরম সত্বার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার পর অনেকেই নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই তাঁহার দৃষ্টি হইতে গায়েব হইয়া যায়।

এই সুক্ষ্ম আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ইহা এমনই একটি নাজুক প্রসঙ্গ যা আন্দাজ-অনুমান বা চিন্তাগবেষনার বিষয় নয়। কথায় কথায় কলমের মুখে আসিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রক সত্বাকে তালাশ করার মত যোগ্যতা যাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহাদের বোধী সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক উন্নত হইয়া থাকে। সর্বদা তাঁহারা বুদ্ধি ও অনুধাবন শক্তি বৃদ্ধির আকাংখা নিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ভিক্ষা করিতে থাকেন। কেন না বুদ্ধির অপরিপক্কতার দরুন বহু জাতি ধবংস হইয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে—জান্নাতবাসীগণের মধ্যে সরল-সোজা মানুষেরই আধিক্য হইবে বটে, তবে সর্বোচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন মাকামে বুদ্ধিমান বান্দাগণই পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন।

মানুষের মধ্যে তিনটি শ্রেণীভেদ আছে। প্রথম শ্রেণীর লোক হইতেছে সাধারণ মানুষের ঐ অংশ যাহারা আহলে হক এর অনুসরণ করিয়াই তুষ্ট থাকে, নিজের তরফ হইতে আন্দাজ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে কম বা বেশী কিছু করার কথা চিন্তা করে না। সব সময় যোগ্য লোকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর লোক উচ্চতর মর্য্যাদা না পাইলেও নিঃসন্দেহে নাজাত পাইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইল যথার্থ অর্থে জ্ঞানী-গুনীগণের দল। ইহারাই ইল্লীন বা সর্বোচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী হইবেন। তবে প্রত্যেক যমানায় ইহাদের সংখ্যা দুই-চারিজনের বেশী থাকে না।

তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে ঐ সমস্ত লোক যাহারা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া শরিয়তের নির্দ্দেশের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকগুলিই সাধারণতঃ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন একজন চিকিৎসক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখেন, রোগীগণ তাহার দেওয়া ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে, যদি সেই ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কোন প্রকার কম-বেশী বা নিজের তরফ হইতে কোন কিছু জুড়িয়া না দেওয়া হয় তবে রোগের চিকিৎসা এবং আরোগ্য হওয়ার আশা থাকে। কিন্তু কোন রোগী যদি অতিচালাকীর আশ্রয় নিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে উলট-পালট করিয়া ব্যবহার করিতে শুরু করে, তবে তার অবস্থা হাতুড়ে কবিরাজের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরূপ হইতে বাধ্য, এই ধরণের লোকের পক্ষে ধ্বংস হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ থাকে না।

এই ধরণের অতিচালাক লোক ইবলিসের অনুগামী। প্রয়োজনাতিরিক্ত চালাকী এবং অপ্রাসঙ্গিক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ইবলিস বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই সে বলিতে সাহস করিয়াছিল যে,—আমি আদমের চাইতে উত্তম, আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে মাটির দ্বারা। (১)

হযরত হাছান বসরীর নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল,—ইবলিস কি অত্যন্ত বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন? জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই, যদি সে অত্যধিক বুদ্ধিমানই না হইত, তবে এত জ্ঞানী লোককে বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হইত না।

প্রকৃত বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী লোকের নিদর্শন হইল, শয়তান তাহাদের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। এই সম্পর্কে ইশারা করিতে যাইয়াই আল্লাহ তা'লা এরশাদ করিয়াছেন ঃ—(ইবলিস)! "আমার প্রিয় বান্দাগণের উপর তোমার কোনই আধিপত্য চলিবে না।" (২)

সুতরাং যাহারা প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হইয়া আল্লাহর নির্দেশের খেলাফ কাজ করিতে শুরু করে, তাহারা শয়তানের সাগরেদ ও প্রতিনিধিতে পরিণত

(১) انا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين -

(২) ان عبادى ليس لك عليهم سلطان -

হইয়া যায়। আল্লাহতালা সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন ঃ—শয়তানকে তোমরা দুশমন হিসাবে গণ্য কর। সে তার অনুসারীদিগকে জাহান্নামী হওয়ার পথে প্ররোচিত করিতে থাকে। (১)

হে আমীর! আখেরাতের জীবনে যদি আপনি সৌভাগ্যবান হইতে চান, তবে আল্লাহর ফরমানকেই একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করুন। আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্যে আশ্রয় তালাশ করার পরিবর্তে অন্য কোন বাতিল পন্থা কোন সময়ই তালাশ করিবেন না। কোন তাগুতী জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণও করিবেন না। যদি আপনার অন্তর সুদৃঢ় হইয়া না থাকে যদি শান্তি ও স্বস্তির অভাব অনুভব করেন, অথবা প্রকৃত সত্যপথ সম্পর্কে যদি আপনার পিপাসা থাকিয়া গিয়া থাকে, তবে আমার কিতাব কিমিয়ায়ে সায়াদাতের মধ্য হইতে প্রকৃত শান্তির পাথেয় সংগ্রহ করুণ। সঙ্গে সঙ্গে এমন কোন একজন হাক্কানী লোকের সাহচর্য্য গ্রহণ করুণ, যিনি শয়তানের থাবা হইতে মুক্ত, যেন তিনি আপনাকেও শয়তানের কবলমুক্ত করিতে পারেন।

দ্বিতীয় পত্র ঃ

বিচারের তাৎপর্য্য এবং বিচার বিভাগে দায়িত্বশীল লোক নিয়োগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ঃ

আপনার উচ্চপদমর্য্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, সাফল্য মণ্ডিত হউক! যেন দুনিয়ার কাজকর্মে আপনার প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝিয়া নিতে পারেন। আল্লাহতা'লা বলিয়াছেনঃ—"এবং তুমি দুনিয়াতেও তোমার হিস্যা বুঝিয়া নিতে ভুলিও না।" (২)

---

(১) فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير -

(২) ولا تنس نصيبك من الدنيا -

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দুনিয়ার প্রকৃত হিস্যা হইল এখান হইতে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা। প্রতিটি মানুষই আল্লাহর পথের মুছাফির। আল্লাহর আদালতের পানেই প্রত্যেকের অব্যাহত যাত্রা চলিতেছে। সেই চলার পথে দুনিয়া হইতেছে কন্টকাকীর্ণ একটি প্রান্তর সাদৃশ্য। এখানে পাথেয় সংগ্রহে অনীহ মুছাফীরের মিছাল হইল সেই হজ্জযাত্রীর মত, যে ব্যক্তি বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছিয়াই আমোদ-ফুর্তিতে মত্ত হইয়া পড়িল।

যদি কোন ব্যক্তি পাথেয় সঙ্গে না নিয়াই মরু-বিয়াবানের পথ ধরিয়া অগ্রসরও হয় এবং ভাবিতে থাকে যে, সে কাবার পানেই চলিয়াছে, তবে তার পক্ষে এইরূপ ধারণা করা ভুল হইবে। কেননা সে তো পাথেয় বিহীন অবস্থায় মরুপথে পা রাখিয়া নিশ্চিত ধ্বংসের কবলে পতিত হইতে যাইতেছে।

এই অনন্ত যাত্রার পাথেয় হইতেছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। আর, তাকওয়ার ভিত্তি হইতেছে দুইটি। এক—আল্লাহর নির্দেশের প্রতি যথাযথ মর্য্যাদা প্রদর্শন। দুই—আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করা।

কোন বাদশাহ যদি তাঁর রাজ্যের ওজারত কিংবা শাসকের দায়িত্ব কোন অযোগ্য অকর্মন্য লোকের হাতে ছাড়িয়া দেন, তবুও তাতে হয়ত তেমন কোন গুরুতর ক্ষতি নাও হইতে পারে, যতদূর ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বিচারকের দায়িত্বে কোন অমার্জিত অসৎ লোককে নিয়োগ করার মধ্যে। কেননা, কোন এলাকার শাসনকার্য্য পরিচালনা এবং ওজারতের কাজ হইতেছে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপার। এই দায়িত্ব কোন ঠেট দুনিয়াদার মানুষের হাতে পড়িলে সে হয়ত তা কোন রকমে সামলাইয়া নিতে পারে, কিন্তু, বিচারকের মসনদ যেহেতু নবুওতের মসনদের উত্তরাধিকার, সেইহেতু বিচারকার্য্য আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করিয়াই সমাধা করিতে হইবে। কেননা, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ করিয়াছেন যে,—"যেন আপনি আল্লাহর তরফ হইতে নাযিল করা বিধান মোতাবেক বিচারকার্য করিতে পারেন।"(১)

সুতরাং বিচার কার্য্য আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ ব্যতীত পরিচালনা করা

---

(১) ولتحكم بما انزل الله -

বৈধ হইবে না। তাই যে ব্যক্তির অন্তরে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও থাকে, সে তাঁহার সেই উত্তরাধিকারের মসনদে ঐ সমস্ত লোককেই নিয়োজিত করিবে, যাহাদের কার্যকলাপের দরুণ হাশরের ময়দানে কোনরূপ লজ্জার সম্মুখীন হইতে না হয়।

উপরোক্ত নীতির প্রতি যদি বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য না রাখা হয়, তবে আল্লাহর নির্দেশের তাজীমও অন্তর হইতে বিদূরিত হইতে থাকিবে। কেননা, রাছুলে মকবুলের (দঃ) মসনদ ও উত্তরাধিকারের প্রতি তাজীম আল্লাহ তা'লার নির্দেশের প্রতি তাজীমেরই নামান্তর মাত্র।

বিচারের মসনদে খোদাভীরু যোগ্য লোক নিয়োগ না করার দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ পরিহার করা। কেননা, দুশ্চরিত্র লোকের হাতে বিচারের দণ্ড চলিয়া যাওয়ার অর্থই হইতেছে নিরীহ জনগণের ইজ্জত-আবরু এবং জান মাল বিপন্ন করিয়া তোলা।

যদি কোন শাসক উপরোক্ত পাপে জড়িত হইয়া যায়, তবে তার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, আখেরাতের জীবনের জন্য সে কি সঞ্চয় করিতেছে।

বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে এতীমের সম্পদের হেফাজত করা। সুতরাং কাজী যদি খোদাভীরু না হয়, তবে এতীমের সম্পদের উপর জায়গীরদারী সুলভ হস্তক্ষেপ শুরু হইবে। অথচ আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন,—"যারা জুল্‌ম করিয়া এতীমের সম্পদ গ্রাস করে, তারা জলন্ত আগুনের দ্বারা উদর পূর্তি করিতেছে, এবং পরিনামে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।"(১)

যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত কঠোর সাবধানবাণী শ্রবণ করার পরও সতর্ক না হয়, তবে তার দ্বারা খোদাদ্রোহীতার যে কোন কাজ করা অত্যন্ত সহজ বলিয়া আমি মনে করি।

অপর পক্ষে বিচার বিভাগে যদি দ্বীনদার পরহেজগার লোক নিয়োগ করা হয় তবে সেই সমস্ত লোকের দ্বারা মুসলমানদের জান-মাল এবং ইজ্জত

(১) ان الذين يا كلون اموال اليتمى ظلما انما يـا كـلـون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا -

আবরুরই শুধু হেফাজত হইবে না, অধিকন্তু সর্বশ্রেণীর নাগরিক সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে সমর্থ হইবে। দেশে কাহারা এলেম ও তাকওয়ার বিচারে কাজীপদে বরিত হওয়ার যোগ্য তা আপনার ন্যায় বিচক্ষণ লোকেরপক্ষে অজানা থাকার কথা নয়। এর পরও সাধারণ নাগরিকগণ যে সমস্ত লোকের জ্ঞান-গরিমা এবং খোদাভীরুতা সম্পর্কে স্বতঃস্ফুর্ত শ্রদ্ধা পোষণ করে সেই শ্রেণীর লোক খুঁজিয়া বাহির করা আপনার পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়।

যা হউক, আপনার দ্বারা দ্বীন ও মিল্লাতের উপকার বৈ অপকার হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অবশ্য কল্যাণকর যা কিছু হওয়ার তা আল্লাহর তওফীক শামিল হইলে পরই সম্ভব। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন।

তৃতীয় পত্র ঃ
রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকে লিখিত

এই পত্রে ইমাম সাহেব কঠোর ভাষায় প্রজাসাধারণের প্রতি ইনছাফ এবং তুস এলাকার জনগণের উপর হইতে রাজস্বের বোঝা হালকা করার সুপারিশ করিয়াছেন। সর্বশেষে উজিরকে স্বীয় পিতা নিজামুল মুলক এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দৃঢ় হস্তে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে।

পত্রের উপরে লেখাছিল,—"স্বাদে কটু হইলেও উপকারী-শরবত প্রেরণ করা হইল। যেন ইহা পান করিয়া নিরিবিলিতে কিছুটা চিন্তা করার সুযোগ হয়। উপকারী কটু শরবত অকৃত্রিম হীতাকাংখী বন্ধুর হাতেই পরিবেশন করিয়া থাকে। বন্ধুবেশী শত্রুদের তরফ হইতে যা পরিবেশন করা হয় তাহা অত্যন্ত সুমিষ্ট হইলেও ভিতরে লুক্কায়িত থাকে মারাত্মক হলাহল।"

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রাছুলে-মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—"আমি এবং আমার পরহেজগার উম্মতগণ অর্থহীন লৌকিকতার বোঝা হইতে মুক্ত।"(১)

(১) انا و اتقياء امتى براء من التكلف -

নানা প্রকার আকর্ষণীয় খেতাব এবং সম্মানসূচক উপাধীর সমাবেশ ঘটাইয়া কাহারও প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা মৌলিকতার ধুম্রজাল সৃষ্টি করারই নামান্তর মাত্র। আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কল্যাণকামীতার প্রেরনায় অন্তরের তীক্ষ্ণ অনুভূতি স্নাত অভিব্যক্তিকে গতানুগতিকতার ক্লেদস্পর্শ হইতে দূরে রাখাই বিধেয়।

যোগ্যতা এবং পদমর্য্যাদা উচ্চতর সীমায় পেঁছার পর তার মধ্যে আরও কতকগুলি খেতাবের তালি সংযোগ করা শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয়, হাস্যাস্পদও বটে। আদবের খাতিরে হইলেও এই ধরনের লৌকিকতাকে আমি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোন সময়ই জমকালো সাজ পোষাকের মুখাপেক্ষী থাকে না।

ইমাম আবুহানিফা, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ উম্মতের মহাজ্ঞানী প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের নামের পূর্বে 'খাজা' শব্দ সংযোগ করিয়া ভক্তিপ্রদর্শন করা যেমন সকলের কানেই অপ্রাসঙ্গিক শুনাইবে, তেমনি আপনার ন্যায় যেসব গুণবান ব্যক্তি স্বীয়গুনের মাহাত্মেই সর্বশ্রেণীর জনগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে, তাহাদের নামের আগে জবরজং ধরনের কিছু খেতাবাদির সংযোগ ঘটানোও ঠিক তেমনি অনভিপ্রেত বলিয়া আমি মনে করি।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু হানিফার সরল সহজ নাম দুইটির সহিত পরিচিত নয়, এমন কোন মুসলমানের অস্তিত্ব মাশরেক হইতে মাগরেবে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ইঁহাদের নামের সঙ্গে 'খাজা' বা অনুরূপ কোন প্রকার খেতাব সংযোগ করাকে হাস্যাস্পদ এই জন্য মনে হইবে যে, মহাত্ম চরম পর্যায়ে পেঁছার পর তার মধ্যে নতুন হাশিয়া চড়ানোও ক্ষতিকর।

জাগতিক মানমর্য্যাদার ক্ষেত্রে আপনার স্থান এমন এক স্তরে গিয়া পেঁছিয়াছে যে, এখন খেতাববিহীন ভাবে আপনাকে সম্বোধন করা হইলেও তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ার মোটেও সম্ভাবনা নাই।

যা হউক, দুনিয়ার জীবনে আপনি সাফল্যের যে স্তরে অবস্থান করিতেছেন দ্বিনী জীবনেও সেইরূপ উন্নত মর্য্যাদা যাহাতে আপনি লাভ করিতে পারেন, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

চিন্তা করিয়া দেখিবেন বয়সের দিক দিয়া বর্তমানে আপনি জীবনের শেষ স্তরে আসিয়া পেঁছিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দ্বীনের কাজে আপনার মধ্যে সেই উৎসাহ আমি দেখিতেছিনা, যা হওয়া দরকার ছিল।

আল্লাহ তা'লা এইরূপ অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এরশাদ করিয়াছেন ঃ "হিসাব দেওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে, অথচ মানুষ এখনও গাফলতিতে ডুবিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখিতেছে।"(১)

রাজা-বাদশাহ এবং আমীর ওমরাহগণের প্রত্যেকেই সব ক্ষমতার আসন সুদৃঢ় করিয়া নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করিতে প্রয়াসী হন। রাজ্যের সীমান্ত এবং আভ্যন্তরিণ শান্তি-শৃঙ্খলা মজবুত করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নানা প্রকার প্রতিরক্ষামুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র এবং সাজ সরঞ্জামের সমাবেশ ঘটাইয়া নিরুদ্বিগ্ন হইতে চেষ্টা করেন। কেহ হয়ত ধন-দওলতের জোরে মজবুত দূর্গ, সুরক্ষিত প্রাচীর-পরিখা এবং শান্ত্রী-সিপাহী বসাইয়া স্ব স্ব ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিতে সচেষ্ট হন। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা ফকীর-দরবেশ এবং দ্বীনদার মুসলমানদের দোয়ার সাহায্যে রাষ্ট্রের কল্যান ও দৃঢ়তার প্রত্যাশী হন।

শেষোক্ত শ্রেণীকে পরিপূর্ণ সাফল্য দান করিয়া আল্লাহ তা'লা প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর সম্মুখে এমন এক জলন্ত নজীর পেশ করিয়া থাকেন, যেন সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, সৈন্য-সামন্তের জৌলুষ এবং অস্ত্র-শস্ত্রের ঝংকার আসমানী আজাব-গজব প্রতিহত করিতে পারে না।

তুসের বর্তমান শাসকের সাম্প্রতিক অবস্থার দ্বারা দ্বিতীয় দলের ধর্মপন্থাকে এমনভাবে ভুল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যেন সে অনুভব করিতে পারে যে, মজবুত দূর্গের লৌহকপাট এবং ধন-সম্পদের বিপুলভাণ্ডার আসমানী আফত দূর করিতে সমর্থ হয় না বরং এইগুলিতে অনেক সময় বিপদ ও ধ্বংসই ডাকিয়া আনে। কুরআন শরীফে এই বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ—"ইহারা সম্পদ সঞ্চয় করিয়া গণনা করিতে থাকে, মনে করে, এই সম্পদই তাহাকে চিরকাল টিকাইয়া রাখিবে। না, এইরূপ কখনও হইবে

(১) اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون -

না, খুবশীঘ্রই উহাদিগকে ভস্মকারক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। তোমরা জান কি সেই ভস্মকারী কি বস্তু! উহা আল্লাহর তরফ হইতে প্রজ্জ্বলিত এমন এক ভয়াবহ অগ্নিশিখা, যা অন্তর্দেশ পর্যন্ত গিয়া প্রবেশ করিবে এবং তীরবৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে।"(১)

অন্যত্র বলা হইয়াছে,—"হায়! আমার সম্পদ আমার কোনই কাজে আসিল না আমার ক্ষমতার দাপট আজ আমাহইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।" (২)

আরও বলা হইয়াছে,—"মৃত্যু—আসার পর তার সহায়সম্পদ কোনই কাজে লাগিবে না।"(৩)

খোরাসানের বর্তমান শাসকের নীতিকে পূর্বোল্লিখিত তৃতীয় পর্যায়ের লোকদের একটি বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার এখানেই দেখা যাইতে পারে যে, দরবেশের শুকনা রুটির টুকরা সেই কাজ করিয়া দিতে পারে, যা লক্ষ লক্ষ ঘোরসোয়ার বা দীনার দ্বারাও করা সম্ভব হয় না। দরবেশদের আহাজারী, শেষ রাত্রের ক্রন্দন ও মুনাজাতে মারনাস্ত্রের ঝনৎকার স্তব্ধ করিয়া দেয়, অশ্বখুরের বুক কাঁপানো আওয়াজের চাইতে দরবেশের আহাজারী অনেক বেশী প্রাণরস সিক্ত, অনেক বেশী প্রভাব বিস্তারকারী শক্তির অধিকারী।

আমার এই কথার সমর্থন পাওয়া যাইবে রাছুলেমকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের হাদীছে। এরশাদ করিয়াছেন,—"দোয়া বিপদ-আপদের গতি ফিরাইয়া দেয়। (৪) আরও বলিয়াছেন,—"দোয়া এবং আপদ-বিপদ একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।"(৫)

---

(১) جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم موصدة في عمد ممددة —

(২) ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه —

(৩) وما يغني عنه ماله اذا تردى —

(৪) الدعاء يرد البلاء —

( ) الدعاء والبلاء يتعالجان —

যে ব্যক্তি তার শাসন ক্ষমতা কর্মচারীর হাতে ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তিনি শান্ত নিবিরোধ হইতে পারেন, তবে যোগ্য নন। আপনার মরহুম পিতা একবার শুনিতে পাইলেন যে, কেরমানের বাদশাহ অনেক দান-খয়রাত করিয়া থাকেন, এই খবর শুনিয়া তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি সদকা-খয়রাত পছন্দ করিতেন না, এমন নয়। বরং তাঁহার ধারণা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমে এমন কোন রাজা-বাদশাহ বা আমীর ওমরাহ নাই, যিনি দয়ায়-দক্ষিণ্যে তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন।

একমাত্র দ্বিনী ব্যাপার ব্যতীত আর কোন ব্যাপারেই হিংসা জায়েয নাই। তবে দ্বিনী ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক হিংসা অনেক সময় ওয়াজেব হইয়া যায়। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন:—শুধু দুই শ্রেণীর লোকের জন্যই পরস্পর হিংসা করার অনুমতি আছে। প্রথম ঐ শ্রেণীর লোক যাহাদিগকে আল্লাহ তা'লা মাল দিয়াছেন এবং তাহারা আল্লাহর রাস্তায় সেই মাল খরচ করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই সমস্ত লোক যাহাদিগকে আল্লাহতা'লা এলেম দিয়াছেন, তারা সেই এলেম অনুযায়ী আমল করে এবং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদিগকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করে।"(১)

তুসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে পরিপূর্ণ ওয়াকেফহাল হওয়া দরকার। জুলুম-অত্যাচার এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়া সমৃদ্ধ সেই জনপদটি বর্তমানে উজাড় হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত আপনি স্বয়ং এই এলাকার দেখাশোনা করিতেন, ততদিন সমাজ-শত্রু ধরনের লোকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া চলিত। কৃষকেরা শষ্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে বাজারে চলিয়া আসিত। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ছিল না। অত্যাচারীরা শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোকদিগকে তোয়াজ করিয়া পথ চলিত। কিন্তু আপনি সেখান হইতে চলিয়া আসার পর শাসনব্যবস্থার সকল বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। কৃষকদের ঘরে এবং

---

(১) لا حسد الا في اثنتين — رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله — ورجل اتاه الله علما فهو يعمل و يدعو الخلق اليه —

শহ্যোর গোলায় রীতিমত লুটেরাদের হামলা শুরু হইয়াছে। বাজারের গুদাম-সমূহে রাতের বেলায় ডাকাতপড়া এখন একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। লোকেরা পরোক্ষভাবে অবশ্য শহরের শাসন কর্তাকেই এই সব অনাচারের জন্য দায়ী করিতেছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রকৃত অপরাধীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করার ব্যাপারে ব্যর্থতা এমন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, নিরীহ দরবেশগণ পর্যন্ত কল্পিত অভিযোগের শিকারে পরিণত হইয়া লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতেছেন।

এই এলাকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমার এই বর্ণনা হইতে ভিন্নতর অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা যদি আপনার নিকট পৌঁছে, এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করা হয়, তবে মনে রাখিবেন, ঐ সমস্ত লোক আপনার দ্বীন-ধর্মে'র দুশমন বৈ কিছুনয়।

আমার উপদেশ হইতেছে, প্রজাসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে খুঁজ-খবর নিন। নিজের আত্মার উপর অনুগ্রহ করুন। আল্লাহর বান্দাদিগকে এইভাবে ধ্বংস হইতে দিবেন না। দরবেশদের দীর্ঘশ্বাস এবং শেষরাতের আহাজারীকে ভয় করুন।

বর্তমান অবস্থা যদি আপনার হাত দিয়া সংশোধিত হয়, তবে উহা আপনার জন্যও খুবই মঙ্গলজনক হইবে। অন্যথায় জনগণের এই হাহাকারে আপনাকেও দগ্ধীভুত করিতে ছাড়িবে না।

আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন, "আমিই কল্যান সৃষ্টি করিয়াছি এবং কল্যানের উপকরণও সৃষ্টি করিয়াছি। সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যাহাকে আমি কল্যানকর কাজের মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছি এবং যার হাত দিয়া কল্যান বিস্তার লাভ হয়। অন্যদিকে ঐ সমস্ত লোকের জন্য আক্ষেপ, যাহারা অনাচারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং অনাচার যাহাদের হাত দিয়া বিস্তার লাভ করিতেছে।"—হাদীছ কুদসী"

যদি কেহ দুর্ভাগ্যবসতঃ এমন পরিস্থিতিতে জড়িত হইয়া পড়ে তবে তার প্রতিকার একমাত্র অনুশোচনার অশ্রুধারাই হইতে পারে,—দ্রাক্ষারসের দ্বারা নয়। আপনার ইয়ার-দোস্তরা মজলুম প্রজাসাধারণের এই অবস্থা সম্পর্কে

সম্পূর্ণ বেখবর হইয়া আমোদ-স্ফূর্তিতে মত্ত রহিয়াছে। আপনার জানা দরকার যে, তুসবাসীদের নেক দোয়া এবং বদদোয়া উভয়ই পরীক্ষিত।

আমি শাসনকর্তাকে এই ধরণের উপদেশ অনেক দিয়াছি কিন্তু সে তা কবুল করে নাই। আজ সে অন্যের জন্য শিক্ষাগ্রহণের সামগ্রীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

মহাপুরুষগণের বাক্যে আছে, প্রত্যেক জালেমের গলদেশে অপর জালেম শক্তি আসিয়া জড়াইয়া পড়ে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'লা উভয়ের উপর হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহা বাস্তব সত্য যে, এই দুনিয়ায় কেহই ধনসম্পদের প্রকৃত মালিক নয়। যেসব লোক টাকা-পয়সা এবং বিষয়-সম্পত্তির মোহে পড়িয়া অন্তর জ্বালাইয়া দেয়, অতিঅবশ্যই উহারা সেই বিষয়-সম্পত্তির বিচ্ছেদ জনিত জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। অবশ্য এই জ্বালারও তিনটি স্তর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম স্তর সৌভাগ্যসূচক। সৌভাগ্যসূচক এইরূপে যে, সেইসব ভাগ্যবানদের সময় থাকিতেই বোধোদয় হয় এবং স্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁহারা টাকাপয়সা বিষয় সম্পদ আল্লার পথে খরচ করে, মজলুমদের পাওনা মিটাইয়া দেয়, এবং গরীব মিছকীনদের মধ্যে খয়রাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিষয়-সম্পদের এই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ইচ্ছাকৃত হওয়া সত্বেও অন্তরে জ্বালা উপস্থিত হয়, তবে ধীরে ধীরে তাহার পক্ষে সেই জ্বালা গা সওয়া হইয়া যায়। কুরআনের ভাষায়ঃ—যাহারা সদকা খয়রাতের ক্ষেত্রে অগ্রনীর ভূমিকা পালন করেন, ইহারা তাঁহাদেরই পর্যায়ভুক্ত হইবেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লোক হইল, যাহারা প্রাণপন চেষ্টা করিয়া টাকা-পয়সা রোজগার করে, সম্পদের পিছনে জীবন পাত করিয়া দেয়, তবে টাকা হাতে আসিলে তদ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াও আল্লাহর আজাব-গজব হইতে রক্ষা পাওয়ার পথ তালাশ করে। সকল প্রকার পাপের গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া ফেলার উদ্দেশ্যেও সাধ্যমত খরচ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোককে কুরআন শরীফে 'মধ্যপন্থী সাবধানী লোক' হিসাবে অভিহীত করা হইয়াছে।

তৃতীয় স্তরের লোকেরা হইতেছে যথার্থ অর্থে হতভাগ্যদের শ্রেণীভুক্ত। কেননা, ইহারা জীবন থাকিতে সম্পদ ছাড়িতে চায়না। আল্লাহর পথে কিছু

দেওয়া তাহাদের ধাতে সয়না। শেষ পর্যান্ত চূড়ান্ত ফয়সালার ভার মালাকুল-মউতের হাতে চলিয়া যায়। আল্লাহ পানাহ্! এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, এই শাস্তি কঠিন শাস্তি। আল্লাহতা'লা বলেন,—আখেরাতের আজাব কঠিনতম, হায় উহারা যদি তা জানতো!

এই শ্রেনীর লোকেরাই জালেম এবং প্রকৃত অনাচারীদের শ্রেণীভুক্ত হিসাবে বিবেচ্য।

তাই বলা হইয়াছে, 'দুনিয়াতেই যে সব লোক অন্যায় করিয়া সাজাপ্রাপ্ত হইয়া যায়, মনে করিতে হইবে, তাহারা সৌভাগ্যবান, নেক বখত্।

আপনি চেষ্টা করুন, যেন সদকা খয়রাতের ক্ষেত্রে সকলের অগ্রনী হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন।

এই উপকারী তিক্ত কথাগুলি এমন এক ব্যাক্তির যবান হইতে শ্রবণ করুণ যে, যার সকল প্রকার চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক দুনিয়ার সমগ্র রাজাবাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার পরই এই ধরনেব উপদেশ প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। আপনি এই উপদেশগুলির মূল্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করুন। মনের মধ্যে এই কথা উত্তমরূপে গাঁথিয়া রাখুন যে, যদি কেহ আসিয়া আমার বর্ণনা করা উপরোক্ত বিষয়গুলির বিরোধী কোন তথ্য আপনার সম্মুখে তুলিয়া ধরে, তবে তা হইবে এই জন্য যে, প্রকৃত সত্য প্রকাশ করার পথে তাহার ব্যাক্তিগত লোভ-লালসা এবং কিছু পাওয়ার আশাই সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে।

আপনাকে আল্লাহর কছম দিয়া বলিতেছি! আপনার মহান পিতার কথা স্মরণ করুণ। অদ্য রাত্রেই সমগ্র জগৎ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িবে তখন আপনি উঠিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাক কাপড় পরিধান করুণ, অজু করুণ এবং নিরিবিলি একটি পবিত্র স্থানে গিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়ুন, ছালাম ফেরানোর পর পুনরায় ললাটদেশ জমিনে ঠেকাইয়া ছেজদারত রুরুদ্যমান অবস্থায় মুনাজাত করুন,—হে আসমান জমিন এবং দুনিয়া জাহানের মালিক? তোমার অপার ক্ষমতার রাজ্যে তো কোন সময়ই ভাটার কোন সম্ভাবনা নাই!

হে মালিক! তুমি এমন এক শাসকের প্রতি অনুগ্রহ কর, যার রাজ্য দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তার দেশবাসীকে গাফলতির নিদ্রা হইতে উদ্ধার কর। প্রজাসাধারনের যথার্থ কল্যান করার তওফীক দান কর।"

এইরূপে কাতরভাবে দোয়া করার পর কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আজকের দুর্ভিক্ষপীড়িত আইন-শৃঙ্খলা বিবর্জিত দেশের মধ্যে প্রজাসাধারণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তা চিন্তা করুণ; কিভাবে উহাদের অবস্থার উন্নতি করা যায়, সেই সম্পর্কে কোন একটা পরিকল্পনা স্থির করার চেষ্টা করুণ। দেখিবেন, সৌভাগ্যের সকল রুদ্ধদ্বার আপনার সম্মুখে আপনা হইতেই খুলিয়া যাইতে থাকিবে, কল্যান এবং বরকত চারিদিক হইতে সমবেত হইতে শুরু করিবে। গায়েবী সাহায্যে আপনার সকল সমস্যার সু সমাধান হইতে থাকিবে। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

চতুর্থ পত্র

[উজারতের পদ লাভ করার পর ফখরুল-মুলককে মোবারকবাদ প্রদান উপলক্ষে ইমাম গাযযালী এই পত্র লেখেন। পত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রজাসাধারণের কল্যান সাধন এবং সর্বস্তরে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করার পর সেই যুগের প্রখ্যাত আলেম ইমাম ইবরাহীম মোবারককে শিক্ষাবিভাগে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুপারিশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, ইবরাহীম মোবারকের ন্যায় একজন এবাদত-গোযার মোত্তাকী পরহেজগার আলেম কোন একটি শহরে থাকিলে সেই শহর এলেম, তাকওয়া এবং আল্লাহর নূরে আবাদ হইয়া যাইবে।]

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দোয়া করি, মহাত্মনের সৌভাগ্য রবি আরও উজ্জল হউক। প্রভাব প্রতিপত্তির পরিধি আরও সুবিস্তৃত হউক। সঙ্গে সঙ্গে আপনার অন্তরদেশও পবিত্র নূরের স্পর্শে উজ্জলতর হউক, এমন নুর যে নুরের প্রভাবে মানব হৃদয়ের সকল সংকীর্ণতা দূর হইয়া প্রোজ্জল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। আল্লাহ

তা'লা যে ব্যক্তিকে হেদায়েত প্রদান করিতে চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন। আর যার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় সেই ব্যক্তি তার পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে হেদায়েতের নুরের উপর কায়েম রহিয়াছে।" (১)

কাহারো অন্তর মধ্যে এই নুর সৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ হইল, সে যখন দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন দুনিয়ার সবকিছু সুসজ্জিত থাকা সত্বেও তার দৃষ্টিতে এর অভ্যন্তর ভাগ নানা প্রকার জঞ্জালে পরিপূর্ণ দেখিতে পায়। চলমান জীবনে মানুষ যতই সুখী সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহার দৃষ্টিতে এই সমস্ত লোকের আখেরাতের জীবন অত্যন্ত সংকটপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মৃত্যুকে যেখানে দুনিয়ার মানুষ ভবিষ্যতের একটি ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত, সেখানে খোদায়ী নুরের আলোকে আলোকিত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা তাৎক্ষনিক বিষয় তথা যে কোন মুহূর্তে হাজির হওয়ার মত বাস্তব সত্য বলিয়া গণ্য করেন।—"তাঁরা জানেন, যা অবশ্যই আসিবে সেই মৃত্যু নিকটেই রহিয়াছে।"(২)

—"তোমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটে রহিয়াছে।" (৩)

দুনিয়ার জীবন যাত্রায় সাধারণ মানুষ যেখানে নিত্য নতুন আশা আকাংখায় উদ্বেল, ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর, সেখানে খোদায়ী নুরে উদ্ভাসিত অন্তর বিশিষ্টগণ আখেরাতের ভয়াবহ চিত্র এবং সুনিশ্চিত বিপদ আশঙ্কায় ক্রমাগত প্রকম্পিত হইতে থাকে। নিজেকে সম্বোধন করিয়াই সে বলিতে থাকে যে,—'তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, (দুনিয়ার এই জীবনে) কয়েকটি বৎসর মাত্র ফায়দা গ্রহণ করার সুযোগ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু তার পরই সেই অঙ্গীকারকৃত (মৃত্যু) তাহার নিকট আসিয়া হাজির

---

(১) فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه -

(২) ويعلم ان ما هوات قريب -

(৩) وان الموت اقرب الى كل احد من شراك نعله -

হইবে। যে সব বিষয় দ্বারা তাহারা এতদিন ফায়দা হাছিল করিয়াছে তার কিছুই সেই দিন কোন কাজে আসিবে না।" (৪)

উজিরে আজম! আপনাকে আল্লাহর তরফ হইতে উপরোল্লেখিত আলোকিত অন্তর প্রদান করা হইয়াছে কি না, তা জানার উপায় এবং লক্ষণ হইল,—অন্তরকে একটি পরিস্কার তক্তিতে রূপান্তরিত করুন। আপনার চোখের সম্মুখে যে সমস্ত আমীর ওমরাহ গত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের যশ-মান এবং জীবন কাহিনীর প্রত্যেকটি দিক সেই তক্তিতে অঙ্কিত করিয়া নিন। তাঁহাদের শেষ পরিণতির কথা তক্তিতে অঙ্কিত যশগাথার পাশাপাশি রাখিয়া একবার গভীর মনোযোগ সহকারে ভাবিয়া দেখুন। আল্লাহতালা কি চমৎকার ভাবেই না এইরূপ চিন্তা করার নির্দেশ দিয়াছেন! বলা হইয়াছে ঃ—"ইহারা কি ঐসব ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন না? ইতিপূর্বে এক এক যুগের কত লোককেই তো আমি ধ্বংশ করিয়া দিয়াছি, তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ইহারা হাঁটিয়া বেড়ায়! এই সব ঘটনার মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাবান লোকদের জন্য শিক্ষনীয় অনেক বিষয় রহিয়াছে।" (১)

"পূর্ববর্তীগণকে কি আমি ধ্বংস করি নাই, এবং পরবর্তীগণকেও কি করিনাই তাহাদের অনুবর্তি ?(১)

রাছুলে মকবুল (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন,—"লোক সকল! মৃত্যু পূর্বনির্দ্ধারিত বাস্তবসত্য। ইহার যে সব হক রহিয়াছে, সেইগুলি ওয়াজেব এর অন্তর্গত। প্রতিদিনই জানাযার আকারে আমাদের মধ্য হইতে লোক চলিয়া যাইতেছে। ইহারা আর কোনদিন আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না।

যখন তোমরা উহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ ভোগ করিতে যাও, তখন এমন ভাবে ভোগকর, যেন তাঁহাদের পর তোমরা অনন্তকাল এখানে বসবাস করিতে। তোমরা প্রত্যেক উপদেশদানকারীর উপদেশ ভুলিয়া যাইতেছ, প্রত্যেকটি সৎলোকের প্রতি অপবাদ আরোপ করিতেছ।"

---

(৪) افرأيت ان متعنا هم سنين ثم جاء هم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون -

( ) الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ان فى ذالك لايت لاولى النهى -

একের পর এক উজির ক্ষমতাসীন হইয়াছেন এবং ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়া বিদায় হইয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই অন্যের পরিনাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ছিলেন। ফলে দেশের যা পরিণতি হওয়ার তাই হইয়াছে। সবাই সেই দৃশ্য দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারো এতটুকু জ্ঞান হয় নাই যে, যে কাজের ভিত্তি দুর্বল হয়, উহার পরিনাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে যারা সেই কাজ করেন, তাঁহারাও ধবংসপ্রাপ্ত হন।

আল্লাহতা'লা এই সত্যটিই এভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "যে সমস্ত লোক আল্লাহ তা'লাকে ছাড়িয়া অন্য অভিভাবকের স্মরণাপন্ন হয়, তাহাদের মিছাল হইল, যেমন মাকড়শা জাল বুনিয়া বাসস্থান তৈরী করে, মাকড়শার সেই ঘর তো অত্যন্ত দুর্বল ক্ষণভঙ্গুরই হইয়া থাকে। হায়! তাহারা যদি এই সত্যটুকু অনুধাবন করিতে পারিত!"(১)

দোয়া করি, আল্লাহ তা'লা উজির আজমকে অন্তরদৃষ্টির দওলত দ্বারা মণ্ডিত করুণ, যেন তিনি তাঁর কর্ম'পদ্ধতির গভীরতা ও প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শুধু বাহ্যিক কাজ-কর্মে'র মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রাখেন।

আল্লাহর তরফ হইতে প্রদত্ত অন্তদৃষ্টির মূল উৎস দুইটি অভ্যাস, একটি সুবিচার এবং অপরটি ন্যায়পরায়ণতা। ন্যায়পরায়ণতা অর্থ—নিজের মধ্যে বান্দাসুলভ এমন একটি অনুভূতি সৃষ্টি করিতে হইবে, যে অনুভূতি সর্বাবস্থায় আল্লাহর সম্মুখে বান্দাসুলভ বিনয় এবং তাঁর দেওয়া দায়িত্বের হক সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত রাখে।

সুবিচার অর্থ হইতেছে,—নিজেকে একজন শাসিত প্রজা হিসাবে কল্পনা করিয়া আপনি শাসকের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার আকাংখ্যা করিবেন, প্রজা সাধারণের সঙ্গে যেন আপনি সেইরূপ ব্যবহারই করেন।

সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, এই দুইটি আদেশকে আপনি জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করুন। বান্দার প্রতি আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও

---

(১) مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون -

এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। ন্যায় বিচারক সুশাসক মাত্রই এই দুইটি আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কোন যোগ্য শাসকের পক্ষেই প্রজা সাধারণের দুরবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা কাম্য হইতে পারে না। কেননা শাসিত জনগণের দুঃখ দুর্দ'শার জন্য কাল মহা-বিচার দিনে শাসককুলকে অবশ্যই যে জবাবদেহীর সম্মুখীন হইতে হইবে, কোন সচেতন শাসকই তার মোকাবেলা করিতে পছন্দ করিবেন না।

আমি বেশ কিছুকাল পুর্ব হইতেই শাসক কর্তৃপক্ষের সহিত মিলা-মিশা এবং পত্রালাপের সম্পর্ক সংকুচিত করিয়া ফেলিয়াছি। বর্তমানে তা আর নতুন করিয়া বিস্তৃত করিতে চাই না। এই কয়টি কথা উজির পদে আপনার নিয়োগ উপলক্ষে মোবারকবাদ প্রদান, বিশেষতঃ দ্বীনদার মুসলমানগণের প্রতি আপনার দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত হইল। এতদসঙ্গে আরও দুই একটি জরুরী বিষয় সম্পর্কে আপনাকে জ্ঞাত করাইয়া দেওয়া হইল মাত্র। সুতরাং আমার পক্ষ হইতে প্রেরীত এই মোবারক বাদী পয়গাম নজরানা-উপঢৌকন শুন্য নয়। নেক দোওয়ার পর উলামাগণের তরফ হইতে জনগণের কল্যাণ ও এছলাহ সম্পর্কে রাজাবাদশাহ এবং আমীর উমরাহগণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং যথার্থ পথ প্রদর্শ'নই হইতেছে শর্বো'ত্তম নজরানা!

জুরজান শহর বেশ কিছুকাল হইতে এমন একজন আমলধারী যোগ্য আলেম হইতে শূন্য হইয়া গিয়াছিল, জনগণের উপর যাঁহার চরিত্রের সুপ্রভাব পড়িতে পারে। সম্প্রতি মুসলিম জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামী বিশিষ্ট আলেম ইবরাহীম মোবারক এই শহরে আগমন করায় তাঁহার এলেম, তাকওয়া এবং মারেফাতের আলোতে চারিদিকে নতুন জীবনের স্পন্দন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁর ওয়াজ নছিহত এবং শিক্ষাদানের প্রভাব দূর দূর পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া জাগাইয়া দিয়াছে। এই ব্যক্তি দীর্ঘ বিশ বৎসর আমার সাহচর্য্যে থাকিয়া তুস, নিশাপুর বাগদাদ, শাম, হেজাজ প্রভৃতি এলাকা ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে আমি সহস্রাধীক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা, তাকওয়া পরহেজগারী এবং নিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার ক্ষেত্রে তাঁহার মত কোন শিক্ষার্থী আমার নযরে পড়ে

নাই। যে জনপদে তাঁহার ন্যায় একজন হাক্কানী আলেম অবস্থান করিবেন, উহা নিঃসন্দেহে আবাদ হইয়া যাইবে।

খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কিছু ঈর্ষাকাতর দুশমনেরও সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত লোক নানা ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা অভিযোগের জাল বিস্তার করিয়া কর্তৃপক্ষের সম্মুখে তাঁহার মর্য্যাদাকে ছোট করিয়া দেখানোর অপচেষ্টা করিতে পারে। আমি মনে করি, এই আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ আলেমকে পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং ইঁহার নেক দোয়াকে দুনিয়া-আখেরাতের পাথেয় রূপে গ্রহণ করার চেষ্টা করা উজিরে আজম হিসাবে আপনার অন্যতম প্রধান দ্বিনী দায়িত্ব। আল্লাহপাক আপনার দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহান কল্যান ও সৌভাগ্যে ভরিয়া দিন। দরবারের মোছাহেব শ্রেণীর দুষ্কৃতিতে সচরাচর যে সব বিপদ আপদ উপস্থিত হইয়া থাকে,—হাক্কানী আলেমগণের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে সেই সবের গতিরোধ করিয়া দিন। আমীন!

পঞ্চম পত্র ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—"কিছু সংখ্যক খাছ বান্দাকে আল্লাহপাক বিশেষ বিশেষ নেয়ামত দান করিয়াছেন। সেই নেয়ামতের দ্বারা সাধারণ লোকদের কল্যাণ করা তাঁহাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহারা সেই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেন তবে বুঝিতে হইবে আল্লাহর তরফ হইতেই এক একজন কর্মী হিসাবে তাঁহারা সেই কাজ করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে। তাঁহাদের পরিনাম হইবে অত্যন্ত ভাল।

দুষ্কৃতকারী গোনাহগারদিগকেও আল্লাহতা'লা নেয়ামত দান করেন। সেই দানের উদ্দেশ্য হইতেছে কিছুটা ঢিল দেওয়া। আল্লাহ তা'লা এই সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ—"আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে তাহাদিগকে পাকড়াও

করিব যে, তাহারা তা জানিতেই পারিবে না। তাহাদিগকে কিছুটা অবসরও দিব, নিঃসন্দেহে আমার কর্মধারা অত্যান্ত সুপরিকল্পিত।" (১)

যারাই আল্লাহতা'লার নেয়ামত বা বিত্ত বৈভবের অধিকারী হইবেন, তাহাদের অবস্থা হইবে দুই রকম। যেমন আল্লাহতা'লা বলেন, "আমি পথ দেখাইয়াছি, অতঃপর হয় তারা শুক্র গোযার হইবে, অন্যথায় কুফুরী করিবে।" (২)

আল্লাহর নেয়ামত, তাঁহার দেওয়া রাজপাট এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে তাঁহার তরফ হইতে রকমারী সাহায্য সহযোগিতার শুক্র গোযারী হইতেছে সততা ও ন্যায়পরায়নতার পতাকাকে সমুন্নত করার চেষ্টা করা, সত্য-ন্যায়ের বাণীকে উন্নতশির এবং জুলুম-নির্যাতনের উৎখাত করিয়া সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা ও সহানুভূতির পরিবেশ গড়িয়া তোলার মাধ্যমেই তা সম্ভব হইতে পারে।

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক এই কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন,—"হে দাউদ! আমি তোমাকে এই দুনিয়ার বুকে খেলাফত দান করিয়াছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর; আর কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, তা হইলে উহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে।" (৩)

দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং নেয়ামত দওলত যেসব লোকের পক্ষে দুর্ভাগ্য এবং মন্দ পরিণতির কারণ হয়, তাহাদের লক্ষণ হইল, ক্ষমতা প্রতিপত্তি এবং সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের দ্বারা আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতনের মাত্রাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই বিষয়টি কুরআন পাকে এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ—

---

(১) سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و املى لهم ان كيدى متين -

(২) انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا -

(৩) يا داؤد انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله -

'আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে এই ভাবেই ধ্বংস করি নাই, এবং তাহাদের অনুবর্তীগণকে ? পাপীদের সঙ্গে আমি অনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। (১)

উহাদের মনমস্তিষ্কে কৃতজ্ঞতা এবং উপেক্ষা এমনভাবে আসিয়া বাসা বাঁধিবে যে, আজাব নামিয়া আসার পর তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইবে :— : হায় ; আমি তো ধারনাই করিতে পারি নাই যে এই সব এমন ভাবে ধ্বংস হইতে পারে ! (২)

অপরদিকে যাহাদিগকে দুনিয়ার নেয়ামত-সম্পদদান করিয়া সৌভাগ্যবান করা উদ্দেশ্য হয়, তাহাদের আলামত হইল, আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ এবং কল্যানকর কাজে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ হইতেই তাহাদিগকে তওফীক প্রদান করা হয়। তীক্ষ্ণ অনুধাবন শক্তি, দ্বীনের প্রতি যথার্থ মহববত এবং কর্তব্য পরায়নতার অনুভূতিতে ঐ সমস্ত লোককে এমন ভাবে সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হয় যে, কোথাও লোভ-লালসা, অন্যায় অনাচার প্রভৃতি যে কোন প্রতিকুল পরিবেশ দেখা দিক না কেন, ঐসমস্ত লোক সেইমত পরিস্থিতিতেও নির্ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সকল প্রতিকুলতা মুলশুদ্ধ উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। সর্বপ্রকার বেদাত কুসংস্কার এবং অর্থহীন লোকাচারের সকল জঞ্জালও উৎখাত করিয়া ফেলে। তাহাদের পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর মাখলুকের প্রতি উদার এবং মমতা পরায়ণ হইতে থাকে। এই ভাবে তাঁহারা সৌভাগ্যের এমন এক স্তরে গিয়া উপনীত হন, যেখানে অবস্থান করিয়া তাঁহারা বিরামহীন ভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের দ্বারা সিক্ত হইতে থাকেন।

আল্লাহপাক আপনার চরিত্রে উপরোক্ত সকল গুণের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটান এবং চরিত্র-মাধুর্য্যের মাধ্যমেই আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সৌভাগ্যের অধিকারী করুণ। আমীন !;

---

(১) الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين - كذالك نفعل بالمجرمين ০

(২) وما اظن ان تبيد هذه ابدا -

তৃতীয় অধ্যায়
উজীরদের পত্র

প্রসঙ্গ কথা

জীবনের এক পর্য্যায়ে আসিয়া হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালীর অন্তর দুনিয়ার সকল সম্পর্ক হইতে দূরে সরিয়া গভীর আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। বাগদাদের প্রখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকার এই সময়ে তিনি পরম আকাংখিত মহা সত্তার ডাক অনুভব করিলেন এবং ছোট ভাই আহমদ গাযযালীকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া হজ্বের সফরে বাহির হইয়া গেলেন। এই যাত্রা তাঁহার অনন্ত যাত্রায় পরিণত হইল। হজ্ব শেষ করার পর বাগদাদে ফিরিয়া আসার পরিবর্তে পথে ঘাটে, বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া তিনি দরবেশের জীবন যাপন করিতে শুরু করিলেন।

বাগদাদ হইতে ইমাম সাহেবের চলিয়া যাওয়ার পর নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বৈশিষ্টহীন হইয়া পড়িল। বাগদাদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র যেন উজাড় হইয়া গেল। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইমাম সাহেবকে দ্বিতীয়বার আসিয়া নিজামিয়ার পরিচালনা ভার গ্রহণ করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষ পরামর্শ শুরু করিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের উজিরগণের মধ্যে এই ব্যাপারে পত্রালাপ হয়। শেষ পর্য্যন্ত ইরাকের উজিরে আজম খোরাসানের উজিরকে ইমাম সাহেবকে বাগদাদে পুনরাগমন করার ব্যাপারে সম্মত করানোর জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন।

নিম্নে উজিরগণের লিখিত দুইটি পত্র এবং সর্বশেষে ইমাম সাহেবের জবাব উদ্ধৃত করা হইতেছে।

খোরাসানের উজিরের প্রতি

ইরাকের উজিরে আজমের পত্র

পরম মর্যাদাবান, জহিরুদ্‌দৌলা, নাছিরুল মিল্লাত উম্মতের গৌরব, উজির কুলের দীপ্ত সূর্য্য, মহান উজিরে খোরাসানের পরমায়ূ দীর্ঘ হউক' সৌভাগ্য ও মর্যাদা তাহার পদচুম্বন করুক। এতদসঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টির মহান দওলত ও হাছিল হউক।

মহাত্মন অবশ্যাই অবগত আছেন যে, জীবনে সর্বোত্তম সুযোগ এবং আল্লাহর তরফ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হইতেছে পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদ্বীনের মহান উত্তরাধিকার সমূহের সংরক্ষন পুনর্জাগরণের জন্য চেষ্টা করা এবং তাহাদের প্রদর্শিত পথে জীবনের গতিধারা পরিচালিত করা। বিশেষতঃ যে শিক্ষার মধ্যে তাঁহার দ্বীনের হুকুম আহকাম, আত্ম সংশোধনের পন্থা এবং পরম কল্যানের নিয়ম-নীতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলিই মুসলিম জাতির পরম কল্যানের নিয়ামক। এর দ্বারা দ্বীন এবং শরিয়তের আহ্‌কামাদি প্রাণবন্ত করিয়া তোলা ছাড়াও দুই জাহানের পরম সৌভাগ্য ও অমূল্য পাথেয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে।

আপনি অবশ্যাই জানেন যে, বাগদাদের নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মর্যাদা রহিয়াছে। পূর্ববর্তী মরহুম বাদশাহ্‌ তাঁর রাজধানীতে তাহারই মহান পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নিদ্দের্শনায় এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন এবং পরিচালিত হইতেছিল। ফলে প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর জ্ঞানের খনি এবং উন্নততর মহৎ চরিত্রের উৎস ক্ষেত্রে পরিগণিত হইয়াছিল। শিক্ষাদিক্ষার কেন্দ্র ও আলেম, গবেষক এবং ইমামগণের প্রধান আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে অল্পকালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। চারিদিক হইতে বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান পিপাসুগণ দলেদলে আসিয়া এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করার সুযোগ লাভ করেন।

মরহুম বাদশাহর কীর্তিগাথা সীমাহীন। রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার কল্যান হস্তের স্পর্শ লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এমন এক অনন্য কীর্তি যার সমকক্ষ অন্যকোন কীর্তিই হইতে পারে না।

বাগদাদের বর্তমান খলিফা মুস্‌তাজহার বিল্লাহর আস্তানার পাশেই অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি কালের সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া চির অক্ষয় থাকিবে। বর্তমান মুসলিম মিল্লাতের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্টিত প্রত্যেকেরই পবিত্র দায়িত্ব হইতেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার উন্নতি বিধান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার যত্নবান হওয়া। প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্যও আদর্শ লক্ষ্য বজায় রাখার প্রতি বিশেষ সচেতন হওয়া আমাদের সকলেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া পরম নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত উহার পৃষ্ঠপোষকতার কাজে শরীক হওয়ার দায়িত্ব আপনাকেও পালন করার আহ্বান জানানো যাইতেছে। কেননা ইরাকভূমি আপনার ঐতিহ্যবান খান্দানের প্রতি যেমন ঋণী তেমনি অত্যন্ত প্রিয়ও বটে।

মাদরাছায় সর্বপ্রথম এমন একজন পরম যোগ্যতা সম্পন্ন সর্বগুণে গুণবান উস্তাদের প্রয়োজন, যাহার জ্ঞাণ প্রজ্ঞা সুগভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের মধ্যে সেই জ্ঞান পরিবেশন করারও পরিপূর্ণ যোগ্যতা রহিয়াছে। অন্যান্য প্রয়োজনাদি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যান্ত গৌণ বিষয়। পরিপূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন উস্তাদ পাওয়াই বর্তমানে উহার সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রয়োজন। কেননা জ্ঞানচর্চ্চার প্রানবন্ততা এবং শিক্ষার্থীগণের প্রধান আকর্ষণ যোগ্য উস্তাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি প্রকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন উস্তাদ হইতে শূন্য হইয়া পড়ে, তবে শিক্ষার্থীগণের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার সকল দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এবং মাল ছামানের যতই প্রাচুর্য্য থাকুক না কেন যোগ্য উস্তাদ পাওয়া না গেলে সকল সাজ-সরঞ্জামও মূল্যহীন অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হইয়া যায়।

এখন পর্য্যন্ত ইমাম তাবারীর দ্বারা মাদরাছার শিক্ষকতার পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালিত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠাপূর্ণ শিক্ষাদান কার্য্যের বদৌলতে আজ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান হইতে বহু যোগ্য মুহাদ্দেছ, মুফাছছের, ফকীহ, এমনকি ইমামের যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম তৈরী হইয়াছেন। ফলে চারিদিকে জ্ঞানচর্চ্চার এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তা দেখিয়া আনন্দে হৃদয়মন পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার তিরোধানে সবকিছু যেন রাতারাতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, জ্ঞান

চর্চার সেই পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাণ চঞ্চল সেই জ্ঞানের বাগিচা যেন উজাড় হইয়া গিয়াছে। ইহাকে বর্তমানে এমন কোন লোক নাই যিনি সেই শূন্যস্থান পূরন করিতে পারেন। ইমাম মরহুমের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন একজন গুণবান শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যাপারে আমরা চেষ্টার কোনই ত্রুটি করি নাই। খোদ খলিফা মুসতাজহার বিল্লাহ এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতঃ ফরমান জারী করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত মহামান্য খলিফা এবং তাঁহার সুযোগ্য পরামর্শদাতাগণ এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন যে, বর্তমানে দ্বীন ও মিল্লাতের পরম শ্রদ্ধেয় ইমাম (আল্লাহ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন) যয়নুদ্দীন হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ গাযযালী ব্যতীত এই মাদরাছার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা আর কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা, তিনি একাধারে যেমন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, যাহেদ এবং ইমামগণের সমপর্যায়ভুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, তেমনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় আস্থাভাজন প্রাজ্ঞ উস্তাদও বটেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উলামাগণ তাঁহার মনীষা ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাই মহামান্য খলিফার ইচ্ছা অনুযায়ী নেজামিয়া মাদরাছার ন্যায় ঐতিহ্যবান প্রতিষ্ঠানের পরিপূর্ণ দায়িত্বভার তাঁহারই উপর পুনরায় ন্যাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত মহান দায়িত্বে পুনঃনিয়োজিত হওয়ার ব্যাপারে যাহাতে তাঁহার পক্ষ হইতে কোন প্রকার দ্বিধা কিংবা অন্য কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারেই আপনাকে বিশেষভাবে কষ্ট দেওয়া হইতেছে।

গভীর আস্থার সঙ্গে জনাবের প্রতি এইরূপ আশাপোষন করা হইতেছে যে, সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে নেজামিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে হুজ্জাতুল ইসলামকে সম্মত করাইয়া তাঁহাকে যেন অনতিবিলম্বে বাগদাদ প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। মহামান্য খলিফা এবং এই খানকার কর্মকর্তাগণের আন্তরিক আকাংখার বিস্তারিত বিবরণ হুজ্জাতুল ইসলামের সম্মুখে পেশ করিয়া কোন প্রকার বিলম্ব ব্যাতিরেকেই যেন তিনি বাগদাদ রওয়ানা হইতে সম্মত হন তার পরিপূর্ণ এন্তেজাম করা আবশ্যক।

ইমাম ছাহেবের খেদমতে বিশেষভাবে এই তথ্য প্রকাশ করা উচিত যে, বর্তমানে তাঁহার ন্যায় একজন প্রাজ্ঞ আলেমের অভাবে এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানটি দীপ্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার শিক্ষার্থীগণ হইতে শুরু করিয়া আলেম, ফকীহ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লোক ইমাম সাহেবের আগমন পথ চাহিয়া গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাকে ব্যতীত এই উৎকণ্ঠা বিদূরিত হওয়ার আর কোন বিকল্প পথ দেখা যাইতেছে না।

মহামান্য খলিফার নির্দেশ, যা পালন করা প্রত্যেকের উপরই পরম পবিত্র এবং অনস্বীকার্য দায়িত্ব, ইমাম সাহেবকে বাগদাদ প্রেরণ করার ব্যাপারে সেই নির্দেশই আপনার প্রতি প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে কোন প্রকার অন্যথা অথবা বিলম্ব হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

হুজ্জাতুল ইসলাম যদি ওজর'আপত্তি করেন অথবা মহামান্য খলিফার নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন করিয়া বসেন, তথাপি তাঁহার কোন কথাই সোনা যাইবে না, তাঁহার কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করিবেন না। যাহাতে তিনি নেজামিয়ার দায়িত্বে ফিরিয়া আসেন, তার ব্যবস্থাই করিতে হইবে। যদি তিনি কোন ওজর উত্থাপন করেন তবে নিজের পক্ষ হইতে তা দূর করিয়া দিবেন এবং তাঁহার সফরের যথাযোগ্য মর্যাদা সম্পন্ন সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যথা সম্ভব শীঘ্র তাঁহাকে বাগদাদ পৌছানোর সকল সুবন্দোবস্ত করিতে কালবিলম্ব করিবেন না। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁহার অপেক্ষায় সকলে পথ চাহিয়া রহিয়াছেন। মাদরাছার পরিবেশ প্রতি মুহূর্তে তাঁহার অভাবে শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদ্বীনের তরিকাকে পুনর্জাগরিত করার যে কোন প্রচেষ্টা সর্বাবস্থায়ই উত্তম ফলপ্রসু বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেমতে উপরে যে সমস্ত বিষয় আরজ করা হইল, সেইসবগুলি পর্যায়ক্রমে কার্যকরি করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি হইবে না বলিয়া আমাদের পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে।"

পত্রে দস্তখত করার পর উজিরে আজম পুনরায় ইমাম সাহেবকে বাগদাদ প্রেরণ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় হওয়ার জন্য উজিরকে অনুরোধ করিলেন।

ইমাম সাহেবের প্রতি

ইরাকের উজিরের পত্র

প্রখ্যাত উজির বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নেজামুল মুল্ক এর পুত্র নিজামুদ্দিন আহমদ ইমাম তাবারীর ইন্তেকালের পর হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম গাযযালীকে নিজামিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করিয়া নিম্নোক্ত পত্রটি লিখিয়াছিলেন।

বিছমিল্লাহির-রাহমানির-রাহীম

মহামান্য ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, আল্লাহ তালার নেয়ামত সমূহের মধ্যে ব্যাক্তি ও গুণের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া এবং তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া বিশ্ববাসীর প্রত্যেকের উপরই অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহলাভ, শুকুর আদায় করা ব্যতীত অন্য কোন পথে সম্ভবপর হয় না। আল্লাহতা'লা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলিয়াছেন;— "যদি তোমরা শুকুর আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই নেয়ামত বাড়াইয়া দিব।" (১)

আল্লাহ তা'লা বান্দাকে যেসমস্ত নেয়ামত দান করেন তন্মধ্যে এলেমের দওলতের চাইতে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ আর কিছুই হইতে পারে না। আল্লাহতা'লা বলিয়াছেনঃ—"যাকে ইচ্ছা তিনি প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাহাকে প্রজ্ঞার নেয়ামত দাম করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যানের অধিকারী করা হয়।" (২)

সুতরাং এই মহামূল্যবান নেয়ামত দ্বারা যাহাকে সুসজ্জিত করা হইয়াছে উহার শুকরিয়া আদায় করা তাঁর উপর সর্বাধীক বড় দায়িত্ব। জ্ঞান পিপাসুগণের তৃষ্ণা নিবারণ এবং মুসলমান সাধারণের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা ব্যতীত এলেমের শুকরিয়া আর কি হইতে পারে?

---

(১) لئن شكرتم لأزيدنكم -

(২) يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ○

আপনাকে আল্লাহ তা'লা এলেম ও প্রজ্ঞার একটি বিরাট অংশ দান করিয়াছেন। এত জ্ঞান আপনাকে দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি এই ক্ষেত্রে সারা মুসলিম দুনিয়ার একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাজ্ঞানী ইমাম হিসাবে আপনি সকল মহলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নজিরবিহীন বৈশিষ্ট এবং মর্যাদার যাকাত প্রদান করাও আপণার উপর ফরজ বৈকি! এলেমের প্রসার এবং জ্ঞান পিপাসুগণের পথ প্রদর্শনই এলেমরূপ মহা সম্পদের প্রকৃত যাকাত বলিয়া আমাদের ধারনা।

এই যুগ আপানার সুপ্রভাবে গৌরবান্বিত। যেখানেই আপনি অবস্থান করুণ না কেন, মুসলিম জনগণ আপনার জ্ঞানের রশ্মিতে আলোকিত হইতে থাকেন। তবে এই সত্য আপনিও অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আপনার ব্যক্তিত্ব যেমন সুউচ্চ, আপনার প্রভাব যেমন সর্বব্যাপী তেমনি আপনার অবস্থান স্থল ও ইসলামী মিল্লাতের কেন্দ্রভূমিতেই হওয়া উচিত। যেন দুনিয়ার সকল এলাকা হইতে জ্ঞান পিপাসুগণ সহজে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হইতে পারেন। আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, বাগদাদ ব্যতীত বর্তমান মুসলমান দুনিয়ার সেই কেন্দ্রীয় গুরুত্ব সম্পন্ন শহর আর দ্বিতীয়টি নাই।

দীর্ঘকাল হইতে বাগদাদবাসীগণ এই রূপ চিন্তা করিয়া আপনাকে এখানে আগমনের জন্য বিনীত দাওয়াত পেশ করিতেছে। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া সকলের এই আরজু পূর্ণ করেন তবে তাহা আমাদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাকর এবং সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক কল্যানের অন্যতম প্রধান উছিলা হিসাবে পরিগণিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বাগদাদ সফরের সিদ্ধান্ত এই সময়ে অত্যন্ত উপকারী এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রশংসার ও কৃতজ্ঞতার কারণ হইবে।"

উজিরে আজমকে লিখিত

ইমাম গায্‌যালী জবাবী পত্র

বিছমিল্লাহির-রাহমানির-রাহীম

আল্লাহ তা'লা বলেন,—"প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই কোন না কোন একটি লক্ষ্য রহিয়াছে, যেদিকে তাহারা মুখ ফিরাইয়া থাকে। তোমরা বরং সৎকর্মে অন্যান্যদের সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে সচেষ্ট হও।" (১)

এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে বিষয়টি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইল প্রত্যেকেরই জীবনের এমন একটা স্থির লক্ষ্য থাকে, যা সম্মুখে রাখিয়া সে জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তার সকল আকাংখা সেই লক্ষ্য স্থলের চারিদিকেই আবর্তিত হইয়া থাকে।

"তোমরা সৎকর্মে অগ্রনী হওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হও।"—এই কথা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, তোমরা জীবনপথে একটি সর্বোত্তম লক্ষ্য স্থির কর এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাক।

মানুষ সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবনের যে লক্ষ্যস্থল স্থির করে তাহা তিন প্রকার হইতে পারে।

প্রথম প্রকার ঐ সমস্ত সাধারণ মানুষ যাহারা গাফেল।

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবিগণ অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় প্রকারের মধ্যে ঐ সমস্ত বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন লোকজনকে শুমার করা হয়, যাহারা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

গাফেল শ্রেণীর লোকেরা দৃষ্টির সম্মুখে পতিত স্থূল ক্ষণস্থায়ী মঙ্গলটুকুই শুধুমাত্র লক্ষ্য করে। তাহারা মনে করে, দুনিয়ার এই জীবনটাই সর্বোত্তম নেয়ামত। দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন সম্পদ এবং বিলাস সামগ্রিকেই সবকিছু মনে করিয়া তাহারা জীবনের সকল মনোযোগ এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ,সমৃদ্ধি অর্জনের পিছনেই স্থিরিকৃত করিয়া ফেলে। ধুনিয়ার সাফল্যকেই

(১) ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ০

পরম পাওয়া মনে করিয়া তৃপ্ত হইয়া পড়ে। অথচ রাছুল মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একটি নিরীহ মেষ পালের মধ্যে দুই দুইটি বাঘের আবির্ভাবে যে সর্বনাশের সৃষ্টি হইতে পারে তার চাইতেও অনেকগুন বেশী সর্বনাশ সাধন হয় মুসলমানের দ্বিনী জিন্দেগীতে সম্পদ এবং পদমর্য্যাদার লালসায়।"

আত্মভোলা গাফেলেরা সেই ক্ষুধার্ত দুইটি ব্যঘ্রের রক্তচক্ষু দেখিয়াও নিজেকে রক্ষার কথা ভাববার মত অবকাশ পায় না। গভীর খাদে পড়িয়া থাকিয়াও ইহারা মনে করে যে, সুউচ্চ মর্য্যাদার আসনেই তাহারা সমাসীন রহিয়াছে। ইহাদের এহেন অধঃপতনের প্রতি ইশারা করিয়াই রাছুলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "দুনিয়ার অর্থ সম্পদের পূজারীরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।" তেমনি, যারা লেবাছের দাস, প্রবৃত্তির দাস, কিছু পাইলে খুশী হয় এবং না পাইলে ক্ষিপ্ত হইয়া যায়, এই শ্রেণীর লোকও নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ।

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীগণ দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা মূলক নিরীক্ষা করার পর আখেরাতকেই দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। কুরআন শরীফের এই আয়াত তাঁহাদের অন্তরদৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে যে, ঃ—নিঃসন্দেহে আখেরাতই উত্তম এবং চিরস্থায়ী।" (১)

তাহাদের প্রজ্ঞা এবং অনুধাবন শক্তি এই সিদ্ধান্তই প্রদান করিয়াছে যে, চির অক্ষয় অনন্ত জীবনে ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই তাহারা দুনিয়ার জীবন হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আখেরাতকেই জীবন পথের লক্ষ্য হিসাবে বাছিয়া নিয়াছেন। আপাতঃ মধুর দুনিয়ার কল্যানের প্রতি লক্ষ না করিয়া আখেরাতের স্বার্থকেই তাঁহারা পরিতৃপ্তির উপকরণ হিসাবে গন্য করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর লোকেরা অবস্য সর্বোচ্চ কল্যাণময় মাকাম তালাশ করিলেন না বটে, তবে দুনিয়ার মোকাবেলায় নিঃসন্দেহে উত্তম বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

সর্বোচ্চ স্তরের খাছ লোকেরা যাঁহারা আহ্‌লে বছিরত বা অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের নিকট অবশ্য এই সত্য প্রকাশিত যে, দুনিয়ার

(১) والاخرة خير و ابقى -

মোকাবেলায় আখেরাতে যাহা লাভ হইবে, তাহাই পরম পাওয়া নয়। দুনিয়াতে যা কিছু আনন্দোপকরণ রহিয়াছে, এইগুলি ক্ষণস্থায়ী এব- আখেরাতের আনন্দোপকরণ স্থায়ী হওয়া সত্বেও উভয়ের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুনিয়ার জীবনে মানুষ যেমন খানা-পিনা, ভোগ-সম্ভোগ ইত্যাদিকে আনন্দোপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়া থাকে, তেমনি আখেরাতের জীবনেও খানা-পিনা ভোগ-সম্ভোগ রহিয়াছে বলিয়া খবর দেওয়া হইয়াছে। ভোগ-সম্ভোগের এই সমস্ত স্থুল লপকরণ পশুসুলভ ভোগস্পৃহার সহিত সাদৃশ্য বিহীন নয়।

কিন্তু এই সমস্ত স্থুল আনন্দোপকরনের তুলনায় দুনিয়া-আখেরাতের স্রষ্টা মহান সত্বার একান্ত সান্নিধ্য এই সব কিছু হইতেও বহু উর্দ্ধের চরম ও পরম পাওয়া একান্তভাবে সেখানে গিয়াই সমাপ্ত হয়। "আল্লাহ সর্বোত্তম ও অবিনশ্বর।" (১) এই মহাবাণীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়াই তাঁহারা, —"জান্নাতের আধীবাসীগণ সেইদিন ভোগ আনন্দে মত্ত থাকিবেন, (২)—এই পর্য্যায় হইতে আরও উর্দ্ধে—"মোত্তাকীগন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর বাদশাহর সন্নিকটবর্তী সেদ্ক এর মাকামে অবস্থান করিবেন, (৩)—সেই চরম ও পরম স্তরকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

শুধু তাই নয়, বরং তাঁহাদের সম্মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর হাকিকত পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তাঁহারা জানিতে পারে যে, যে লোক যে জিনিষের খেয়ালে মত্ত হইয়া যায়, সে সেই বস্তুরই গোলাম বা বান্দায় পরিণত হয়। শেষ পর্য্যন্ত সেই বস্তুই তার পরম আকাংখিত মাবুদে রূপান্তরিত হয়। রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এই বিষয়টির প্রতি ইশারা করিয়াই সম্পদের পূজারীগণকে "দেরহামের বান্দা" হিসাবে অভিহীত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত লোকের শেষ লক্ষ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরম সত্বা নয়, তাহাদের ঈমান পরিপূর্ণ হইতে পারে না। এইরূপ ঈমান পরোক্ষ শেরেকী হইতে মুক্ত নয়।

---

(১) والله خير وابقى -

(২) ان اصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون -

(৩) فى مقعد صدق عند مليك مقتدر -

এই সমস্ত লোক জীবনের সবকিছুকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটিকে অপরটির মোকাবেলায় দাড় করাইয়া থাকেন। এর একভাগে আল্লাহ এবং অন্য ভাগে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু। অতঃপর দুইটি দিগকে পাল্লার দুইদিকে রাখিয়া অন্তরকে সেই পাল্লার কাঁটায় পরিণত করেন। অন্তর যখন উত্তম দিকের প্রতি ঝুকিতে দেখেন তখন তারা উহাকে নেকীর পাল্লা ভারি বলিয়া অভিহিত করেন। অপরদিকে পাল্লা অন্যদিকে ভারী হইতে দেখিলে বলিয়া ফেলেন যে, বদীর পাল্লা ভারি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা অনুভব করেন যে, এই দুনিয়ায় তাঁহাদের সেই পাল্লার ভারসাম্যের সঙ্গেই কেয়ামতের ওজন নির্ভর করিবে। নেকী এবং বদীর পাল্লার ভারসাম্য যদি এই দুনিয়াতে রক্ষিত না হয়, তবে আখেরাতেও তাহা রক্ষিত হইবে না।

সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের লোকদের দৃষ্টিতে প্রথম স্তরের লোকেরা যেমন আনাড়ী অজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হয়, তেমনি তৃতীয় স্তরের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা অজ্ঞ আনাড়ি হিসাবে বিবেচিত হইবেন। আনাড়ীরা কখনও খাছ লোকদের কথা বুঝেনা। এই কথাও বুঝিতে পারে না যে, আল্লাহ তা'লার প্রতি অনাবিল মনোযোগ কাহাকে বলে?

উজিরে আজম (আল্লাহ তাঁহার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন) আমাকে যখন অনুন্নত একটি স্থান হইতে উন্নততর স্থানে চলিয়া আসার দাওরাত দিতেছেন, তখন আমিও তাঁহাকে "আছফালে ছাফেলীন" বা সর্ব নিকৃষ্ট স্তর হইতে "আলা ইল্লিয়িনে" বা সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছার দাওয়াত দিতেছি। কেননা, আছফালে ছাফেলীন পূর্বোল্লেখিত প্রথম স্তরের লোকদের স্থান এবং আ'লা ইল্লিয়িন তৃতীয় স্তরের লোকদের।

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করিবে, তুমিও তার উত্তম বদলা দাও।' আমি যেহেতু আপনার সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে অপারগ, তাই আপনাকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার পথে দাওয়াত পেশ করিতেছি, যেন আপনি খুব শীঘ্র সাধারণ মানুষের পর্য্যায় হইতে উন্নীত হইয়া খাছ লোকদের পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন।

আল্লাহর দৃষ্টিতে তুস বাগদাদ কোন বস্তুই নয়, সমগ্র দুনিয়ার পথই বরাবর। তাঁহার নিকট কাছে বা দুরের কোন পার্থক্য নাই।

আপনার জানিয়া রাখা উচিত যে, আপনার দ্বারা যদি শরিয়তের কোন একটি ফরজ আদায় হওয়ার ব্যাপারেও কোন ত্রুটি থাকিয়া যায় অথবা কোন একটি কবীরা গোনাহও হইয়া যায়, কিংবা একটি রাত্রিও আপনি গাফেলের নিদ্রায় আভিভূত হইয়া পড়েন অথবা একটি মজলুম বিপদগ্রস্ত লোকের পূর্ণ খবর গিরীর দায়িত্বও পালন করার ব্যাপারে আপনার দিক হইতে কোন ত্রুটি হইয়া যায়, তবে আপনার স্থান গোমরাহীর গভীর খাদ ব্যতীত অন্য কোথাও হইবে না। আপনি তখন সর্বোচ্চস্তরের গাফেলদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবেন। যারা এই দুনিয়ায় আত্মভোলা গাফেলদের জীবন-যাপন করিবে, আখেরাতের জীবনে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাইবে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তা'লা যেন আপনাকে গাফলতের নিদ্রা হইতে সজাগ করিয়া দেন, যেন সবকিছু হাতছাড়া হইয়া যাওয়ার আগেই আপনি ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

এখন আমি বাগদাদের মাদরাছায় ফিরিয়া আসার প্রসঙ্গে কিছু বলিতে চাই এবং এই ব্যাপারে আমার ওজর পেশ করিতেছি। আমার ওজর হইতেছে, রাজধানীতে ফিরিয়া আসার উদ্দেশ্য হয় দ্বীনি জীবনের উন্নতি, অন্যথায় দুনিয়ার জীবনের আয়-উন্নতির আকাংখা। কিন্তু দুনিয়ার জীবনের উন্নতি এবং সম্পদ ও পদমর্য্যাদার আকাংখা আল্লাহর অনুগ্রহে অনেক আগেই অন্তর হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অন্তরকে পুনরায় দুনিয়ার স্বার্থ ও পদমর্য্যাদার মোহে, নিয়োগ করা দ্বিগুণ মুছিবত ডাকিয়া আনারই নামান্তর হইবে! কেননা, বর্তমানে আমি যে কাজে লিপ্ত আছি, কোন পদমর্য্যাদার ঝামেলায় পতিত হইলে সেই কাজ অসমাপ্ত এবং সমস্ত সাধনা বেকার হইয়া যাইবে।

অবশ্য দ্বিনী উন্নতি এবং এলেমের ক্ষেত্র ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে এখান হইতে বাগদাদ চলিয়া আসাই আপাতঃ দৃষ্টিতে শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। কারণ শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষার্থী সেখানে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী রহিয়াছে। কিন্তু আমার পক্ষে দ্বিনী জীবনের এই উন্নতির পথেও অনেক

প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দ্বিনী এবং দুনিয়াবী উভয় প্রকারেরই। বাগদাদের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করিলে এখানে যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করা সম্ভব হইবে না। কেননা, বর্তমানে এখানে অনুমান দেড়শত অত্যন্ত যোগ্য এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার্থী আমার শিক্ষাধীনে রহিয়াছে। ইহাদের পক্ষে বাগদাদ স্থানান্তরিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইবে। অন্যস্থানে শিক্ষার্থী বেশী পাওয়ার আশায় এই সমস্ত লোককে নিরাশ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে যদি দশটি এতিম শিশু লালিত-পালিত হইতে থাকে, তবে এই অবস্থায় অন্য স্থানের বিশটি এতীম পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনায় এই দশটিকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়ার মতই হইবে আমার এই পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়তঃ যখন মরহুম উজির নেজামুল মূলকের আহ্বানে আমি বাগদাদের মাদরাছায় যোগ দিয়াছিলাম, তখন আমার কোন পারিবারিক দায়-দায়ীত্ব ছিল না। বর্তমানে আমি পরিবার-পরিজনের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি। ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিতে প্রস্তুত নয়, ইহাদিগকে মনে কষ্ট দিয়া ফেলিয়া যাওয়াও জায়েয হইবে না।

তৃতীয়তঃ আজ হইতে প্রায় পনের বৎসর পূর্বে আমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পবিত্র মাজারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই পবিত্র স্থানে বসিয়া আমি তিনটি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যা আজ পর্য্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছি। অঙ্গীকারগুলি হইতেছে, এক—কোন বাদশাহর দরবারে যাইব না, দুই—কোন বাদশাহর মাল ভোগ করিব না, তিন,—কখনও বহছ-মুনাজারা করিব না। এখন যদি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে যাই, তবে মনমস্তিস্ক আহত হইয়া যাইবে। এই আহত মানসিকতায় কোন দ্বিনী কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেওয়া সম্ভব হইবে না। বাগদাদে বহছ-মুনাজারা ব্যতীত টিকিয়া থাকার উপায় নাই। তাছাড়া ছালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে খলিফার দরবারেও হাজির হইতে হইবে,—যা আমি কোন অবস্থাতেই পছন্দ করিনা। ইরাক ও শাম হইতে ফিরিয়া আসার পর আমি আর কোন ছালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে খলিফার দরবারে যাই নাই। সবচাইতে বড় ওজর হইতেছে, আমি কোন প্রকার বেতন বা ভাতা কবুল করিতে পারিব

না। বাগদাদে আমার কোন বিষয়-সম্পত্তিও নাই। আয়-আমদানীর অন্য সব পন্থা আমি বহু আগেই নিজ হাতেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। তুসে আমার যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তি আছে। তাতে পরিবার-পরিজনদের মোটামুটি ভরণ-পোষণ হইয়া যায়। আমার অনুপস্থিতিতে এই যৎসামান্য সম্পত্তিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতেছে বাগদাদ আসার পথে আমার সম্মুখে দ্বিনী অন্তরায়। অন্যেরা হয়ত এই সব বিষয়কে নিতান্ত মামুলী মনে, করিতে পারেন, কিন্তু, আমার দৃষ্টিতে কারণগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জীবন সূর্য্যও যেহেতু বর্তমানে অপরাহ্নের আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, সুতরাং এই সময় ইরাক সফরের নয়। সেমতে জনাবের বরাবরে এইরূপ আশা করিব যেন, উপরোক্ত ওজর সমূহ কবুল করিয়া নেওয়া হয়। মনে করুন, গাযযালী একপথে বাগদাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অন্য পথে যদি আল্লাহর ফরমান আসিয়া হাজির হয়, তবে তো নিরুপায় হইয়া আপনাদিগকে অন্য শিক্ষক তালাশ করিতেই হইবে। সুতরাং সেইরূপ সম্ভাবনার কথা মানিয়া নিয়াই আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করি।

আল্লাহ পাক উজিরে আজমকে ঈমানের হাকিকত দ্বারা উদ্ভাসিত করুন যেন দুনিয়া এই ঈমানের রওশনীতে উজ্জল হইয়া উঠে।

উজির সেহাবুল ইসলামকে লিখিত ইমাম সাহেবের পত্রাবলী

উজির সেহাবুল ইসলামকে ইমাম গাযযালী যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন সেইগুলিতে আত্মার রোগ এবং তার চিকিৎসা, আত্মা যেসমস্ত কারণে ব্যধিগ্রস্ত হয় সেই সব কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকার উপদেশ এবং সাধক শ্রেণীর লোককে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, বিশেষতঃ সাধক আল্লা ওয়ালা গণের সহিত গভীর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে।

প্রথম পত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার ওজারতের দরবার দীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণে ভরপুর হউক। কালের কুটীল প্রবাহ, ক্ষতিকারক সকল প্রভাব এবং শয়তানের মকর ফেরের হইতে আপনার অন্তর নিরাপদ হউক।

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ—সদকা-খয়রাত তোমাদের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ"। সাধারণ মানুষের ধারনায় এই হাদীছ দ্বারা শারিরীক রোগ-ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু খাছ লোকেরা হাদীছের আসল ইশারা অন্তরের রোগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শারিরীক ব্যাধি এবং আত্মার রোগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। আল্লাহ তা'লা বলেন,—"উহাদের অন্তর মধ্যে রোগ রহিয়াছে।"

অন্তরের রোগ যেমন জটিল তেমনি ব্যাপকও। কেননা হাজার মানুষের মধ্যে একজন শারিরীক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। আর হাজার জনের মধ্যে একটি অন্তরও ব্যাধিমুক্ত দেখা যায় না। এই রোগের আক্রমণ হইতে শুধুমাত্র সেই সব লোকই নিরাপদ হইতে পারে, যাহাদিগকে আল্লাহ পাক শুদ্ধ অন্তর দান করিয়াছেন।

শারিরীক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকদের মধ্যে যেমন বিশেষ বিশেষ খাদ্য বা পানীয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হইতে দেখা যায়, তেমনি আত্মার ব্যাধির আলামত হইতেছে, আত্মার প্রিয় খাদ্য হইতে বিতৃষ্ণা ও অনিহার সৃষ্টি। আত্মার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য হইতেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জিকির। উপযুক্ত খাদ্য ব্যতীত যেমন শরীর টিকে না, তেমনি আত্মাও তার প্রয়োজনের অনুকুল খাদ্য না পাইলে সুস্থ এবং সতেজ থাকিতে পারে না। এই সত্যের প্রতি ইশারা করিয়াই বলা হইয়াছে,—"অবগত হও! আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তরের পূর্ণ স্বস্তি লাভ হইয়া থাকে।"

আল্লাহর জিকির ব্যতীত যে সব লোক জীবন-যাপন করিতেছে. উহাদের অন্তর মৃত। বলা হইয়াছে,—"কুরআনের মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহাদের অন্তর রহিয়াছে।"

আত্মার হাকিকত সম্পর্কে সকলে জ্ঞাত থাকে না। অন্যথায় তার পুষ্টিকর খাদ্য এবং সর্বাত্মক বিষয়ের মধ্যে তারা তফাত করিতে সমর্থ হইত। বলা হইয়াছে, "আল্লাহ্ তা'লা মানুষ এবং তার অন্তরের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করিয়াছেন।"

রছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন,—তোমরা মৃত লোকদের মজলিশে বসিও না" ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ (দঃ) ঐ সমস্ত লোক কাহারা?

জবাব দিলেন—ধনবান সম্প্রদায়।

ধনের মালিকেরাই কিন্তু প্রকৃত ধনী নয়। প্রকৃত সম্পদশালী ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তর ঐশ্বর্যময়। এই সমস্ত লোক নিজেরাই অন্তরের রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন।

মাল সদকা দিয়া রোগের চিকিৎসা করার অর্থ এখানে শুধু সম্পদ ব্যয় করা নয়। আত্মার রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এমন একজন দক্ষ চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া যিনি অন্তর-রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং নিজে রোগাক্রান্ত নহেন। এই যুগেও সৌভাগ্য বশতঃ এই ধরনের দক্ষ চিকিৎসকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অন্তর-লোকের বিভিন্ন মাকামাতের মধ্যে তওহীদের দরজা সবোর্চ্চে। মৌলিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এই দরজা হাছিল হয় না। মারেফাত এবং ঐকান্তিক আগ্রহ বা 'জয্‌ব' এর মাধ্যমেই তা হাছিল হইতে পারে। যে কোন একজন আরেফ মজযুবকে দেখিয়াই এই সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যাইতে পারে।

আরেফ তিনিই, যাঁর মারেফাত, তাকওয়া ও যুহ্‌দের নুর কখনও নির্বাপিত হয় না। সেই অনির্বান শিখা সদাজাগ্রত রাখিয়াই তিনি সর্বদা পথ চলেন।

এই ধরনের একজন যাহেদ আরেফকে আপনার নিকট পাঠানো হইল। পরিবার-পরিজনের ভরন-পোষনে অসমর্থ হইয়া তিনি সম্প্রতি এখানে আগমন করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হইতে তাঁহার কোন কোন প্রিয় বান্দার উপর কঠিন দারিদ্রের বোঝা চাপানোর পিছনেও একটি সুক্ষ্ম রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে।

এই সমস্ত দারিদ্রগ্রস্ত মহান ব্যক্তিগণের খেদমত করার সুযোগ লাভ করিয়া সম্পদশালী এবং তৎসঙ্গে সৌভাগ্যবান বান্দাগণ এই উছিলায় পরম সৌভাগ্যের মনজিলে পেঁাছিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের পথ পরিক্রম সহজতর হয়।

আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে উত্তমরূপেই অবগত আছেন। তিনি কখনও কখনও ক্ষুধা ও দারিদ্রের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে মুখাপেক্ষীতার আগুনে জ্বালাইতে থাকেন এই প্রক্রিয়াতেই তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির পঙ্ক হইতে পরিচ্ছন্ন করিয়া নেন। এমন কোন দারিদ্রগ্রস্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দার খেদমত করার মত সুযোগ যদি কোন ধনবান ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে, তবে তাহাকে চরম সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

জনাবের প্রতি আবেদন,—এই আল্লাহর বান্দার অসুবিধা দুর করার জন্য সচেষ্ট হউন। বিশেষতঃ একান্তে বসিয়া ইহার মূল্যবান কথা-বার্তা শ্রবণ করিবেন। আশা করা যায়, ইহার উপদেশাবলী আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং সৌভাগ্যসূচক হইবে।"

দ্বিতীয় পত্র

[শায়খ আবুবকর আবদুল্লাহর নির্দেশক্রমে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী জনৈক বয়োবৃদ্ধ আলেমের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার জন্য উজির সেহাবুল ইসলামের নামে এই পত্রটি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তা'লা আপনাকে পরিপূর্ণ নেয়ামত ভাণ্ডার দান করুণ এবং শাসন কর্তৃত্বের ছায়া সর্বদা আপনার উপর কায়েম থাকুক। আল্লাহর তরফ হইতে প্রদত্ত নেয়ামতরাশীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং নেয়ামতের হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার তওফিক হউক।

পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভ করার অর্থ হইতেছে, এই দুনিয়ার সকল সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হওয়ার পর আখেরাতের জীবনেও সকল বাদশাহর বাদশাহ মহান আল্লাহ তা'লার সম্মুখে মর্যাদার আসন লাভ হওয়া। যদি এই উভয়বিধ নেয়ামত দ্বারা মণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য হাছেল হয়, তবে উহাই হইবে চরম সৌভাগ্য, নেয়ামতের পরিপূর্ণতা লাভের লক্ষণ। বান্দার ভাগ্যে দুই ধরনের 'মাকাম' লাভ হইয়া থাকে। একটি মাকামে ছেদ্‌ক এবং অন্যটি মাকামে যুর'।

যারা সর্বকাজে একমাত্র আল্লাহর নিকটই সকল আকাংখা নিবেদন করিয়া তৃপ্ত, তাহারা মাকামে ছেদকে অবস্থান করিয়া থাকে।

আল্লাহ তা'লা বলেন,—"আমি সেই ব্যক্তির সঙ্গী এবং বন্ধুতে পরিণত হই যে আমাকে একান্তভাবে স্মরণ করে।

অপর পক্ষে যে মহামহিম আল্লাহর নির্দেশাবলী হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্ধ কিছু তালাশ করে, আমি তাহার পিছনে একটি শয়তান নিযুক্ত করিয়া রাখি, সেই শয়তানই তাহার সঙ্গী বন্ধুরূপে অবস্থান করিয়া থাকে।

একমাত্র আল্লাহকেই যাহারা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "তোমরা যখন সেখানে দৃষ্টিপাত করিবে তখন অফুরন্ত নেয়ামতরাশী এবং বিশাল রাজ্য দেখিতে পাইবে।" আর যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তিকে সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে, তাহাদের নজির হইতেছে মরুভূমির মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়, সচরাচর যাহা পানি বলিয়া ভ্রম হয়, নিকটে আসিলে আর কিছুই দেখা যায় না। জীবন তাহাদের সেই মরুভূমিসম প্রতিপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর সান্নিধ্য ব্যতীত আর তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। যে আল্লাহ সর্বকর্মের হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দক্ষ দ্রুতগতি সম্পন্ন।"

উন্নত রুচীসম্পন্ন সৎসাহসী লোকদের পক্ষে মহত্তর বস্তু ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্টকে গ্রহণ করা সাজে না। হযরত ওমর ইবনে আবদুলাহ আজীজ সম্পর্কে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে হাজার টাকা মূল্যের মোলায়েম পোষাকও তাঁহার নিকট অমসৃণ বলিয়া মনে হইত! আর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পাঁচ টাকা মূল্যের পোষাকও তাঁহার কাছে বেশী মোলায়েম বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ রুচি

পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তিনি জবাব দিয়াছিলেন,—প্রথম হইতেই আমার রুচি এত উন্নত ছিল যে, সর্বোত্তম বস্তু হাতে পাইয়াও 'নাফছ, তৃপ্ত হইত না। দুনিয়ার জীবনে চাওয়া-পাওয়ার শেষ স্তর বিশাল খেলাফতের স্বাদ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া নাফছের সেই অতৃপ্ত কামনা কানায়-কানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন তারও উপরের দরজা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জ্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়াই উন্নততর রুচির শেষ স্তর বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

আপনাকে আল্লাহ তা'লা দুনিয়ার জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই এখন আরও বড়, মানবীয় সৌভাগ্যের চরমতম স্তরের প্রতি অগ্রসর হওয়াই আপনার পক্ষে সমিচীন হইবে। হাদীছ শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে যে,—একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুনিয়ার জীবনের চরম সৌভাগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভ করার অধিকারী হওয়া মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা মহান দাতা, অপরিসীম করুণাময়।

আজকের এই পত্র লেখার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে, একজন বৃদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তির প্রতি আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করা। দীর্ঘকাল তিনি মহান সাধক সমাজের সঙ্গে থাকিয়া একাধারে এলেমের খেদমত এবং সাধক জীবন যাপন করিয়াছেন, সম্প্রতি জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়া কর্মশক্তিহীন দুর্বল হইয়া পড়ার কারণে পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

বর্তমান যুগশ্রেষ্ঠ সুফী-সাধক শায়খ আবুবকর আবদুল্লাহ আমাদের অনেককেই উপরোক্ত বৃদ্ধ বুযুর্গের নিকট হাজির হইয়া উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এদতসঙ্গে বর্তমানে রুজী রোজগার করিতে অক্ষম এই বুযুর্গ সম্পর্কে আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমার প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন।

মহান পরওয়ারদিগারের দরবারে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করিয়া মুনাজাত করি,—আল্লাহপাক যেন আপনার দৃষ্টিতে দুনিয়াকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া উর্দ্ধজগতের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম উপলব্ধি করার তওফীক দান করেন। আপনার অন্তরদৃষ্টি যেন প্রসারিত করিয়া দেন! আপনার প্রতি ছালাম।

তৃতীয় পত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আপনার সৌভাগ্যরবি চির অম্লান হউক। রাজকীয় মর্য্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী হউক। দুশমনদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া আপনার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। শয়তানী ধোকা এবং দুশমনের হিংসার আগুন হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ছহি-ছালামতে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ চির অক্ষয় হউক।

দীর্ঘ ছফরের তকলিফ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছহি-ছালামতে ফেরৎ আসা এবং পুনরায় সরকারী গুরুদায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়ার এই আনন্দঘন সময়টিতে আমার পক্ষ হইতে আন্তরিক মোবারকবাদ গ্রহণ করুন।

সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত বিপর্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এইগুলির কুপ্রভাব হইতে আল্লাহ পাক আপনাকে মুক্ত রাখুন।

নেককারগণের আন্তরিক দোয়ার বরকতে এই পর্যান্ত আপনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরম সাফল্য লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ভবিষ্যতেও আপনি সর্বাবস্থার আল্লাহর খাছ মদদ পাইতে থাকিবেন।

আমার একান্ত আকাংখা, আপনি এমন এক উচ্চ মর্যাদায় গিয়া পৌঁছিয়া যান, যেখানে দুনিয়াবী কোন বিপর্যাই অপনাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। সেই পর্যায়ে পৌছার জন্য প্রয়োজন দুনিয়ার হিংসা-দ্বেষ এবং অর্থহীন আকাংখার পিছনে জীবনপাত করার মনোভঙ্গি হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি। সুতরাং আপনিও দুনিয়া-দারীর সকল আবিলতা হইতে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া একান্তভাবে এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে মশগুল হইতে চেষ্টা করুন। এলেমের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। আমার ধারনায় এলেমের প্রসারের চাইতে উত্তম এবাদত আর কিছু হইতে পারে না। অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ তা'লার সাহায্য ও অনুগ্রহের উপর স্থির করিয়া রাখুন।—"আপনি বলুন, একমাত্র আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের

প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তোমরা যাহাকিছু অর্জ্জন করিতেছ, তাহা হইতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বহুগুণ শ্রেয়।' (১)

এতদিন মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতি আপনি নির্ভর করিয়া আসিতেছিলেন। এর কি পরিণতি তা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুরআন শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে,—"আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহারা অন্য কাহাকেও বন্ধু অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, তার মিছাল হইল, মাকড়সার জালে ঘর বাঁধার মত। অথচ সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঘর হইতেছে মাকড়সার বাসস্থান। হায়; এই সত্যটুকু যদি উহারা অনুভব করিতে পারিত।"

একমাত্র লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর ভরসা করিতে পারিলে দেখিতেন, সমগ্র সৃষ্টি অনুগত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি পর্যন্ত আপনার সর্বকর্মে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইতেছে।

অপর পক্ষে যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর ভরসা করিলে পর তা এমন একটি অসার ইমারতে পরিণত হইবে যে ইমারতের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে সমুদ্রের ঢেউ-এর উপর। কেননা বর্তমান যুগ নানা ফেতনা ফাছাদের যুগ। অস্থিরচিত্ততা এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুর্বে মানুষের অন্তরে যেমন স্থিরতা ছিল, বর্তমানে তা খুবই বিরল।

আল্লাহ তা'লা আপনাকে সৃষ্টির প্রতি ভরসার বিড়ম্বনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া আল্লাহর উপর পূর্ণ মাত্রায় ভরসা করার তওফীক দান করুণ। তওফীক একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে এবং বিশেষ দানের উপরই নির্ভরশীল!

---

(১) قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فليفرحوا هو خير مما يجمعون -

উজির মুজিরুদ্দীনকে লিখিত পত্রাবলী

প্রথম পত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তা'লা বলেন,—"তোমাকে আল্লাহপাক যা কিছু দান করিয়াছেন, তদ্বারা আখেরাতের উত্তম আবাসের আকাংখী হও। এতদসঙ্গে দুনিয়ার জীবনে তোমার যা পাওনা, তার কথাও ভুলিয়া যাইও না। তোমার প্রতি আল্লাহ পাক যেমন ভাবে এহছান করিয়াছেন, তুমিও তেমন ভাবে আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি এহ্ছান কর।" (১)

মাননীয় উজির মুজিরুদ্দীন! আপনার পক্ষে আল্লাহ তা'লার উপরোক্ত কালামের প্রতি গভীর চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কেননা, আল্লাহর প্রত্যেকটি কালামই এক একটি সমুদ্র বিশেষ এবং এই সমুদ্রে অসংখ্য মহামুল্যবান মণিমুক্তা লুক্কায়িত রহিয়াছে।

দ্বিনী-বছিরত বা অন্তদৃষ্টির মাধ্যমেই সেই সমুদ্রে ডুব দিয়া মুক্তা আহরন করা সম্ভব। দুনিয়ার ধ্বংশশীল এই যৎসামান্য নেয়ামতের মধ্যেই যাহাদের দৃষ্টি ডুবিয়া গিয়াছে, অথবা যাহারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগ-সম্ভোগকেই জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আল্লাহ তা'লার উপরোক্ত কালামের মর্মার্থ অনুধাবন করিতে সম্পুর্ণ অক্ষম। এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কেই আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন,—

ঃ যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার জীবন এবং তার সাজ-সজ্জার প্রতিই একান্ত ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে, তাহাদের সকল প্রচেষ্টার প্রতিফল এই দুনিয়ার জীবনেই পরিপুর্ণভাবে চুকাইয়া দেওয়া হইবে।

দুনিয়ার জীবনে তাহাদিগকে কোনরুপ ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। উহারা ঐ সমস্ত লোক, আখেরাতের জীবনে জাহান্নাম ব্যতীত যাহাদের আর কোন

---

(১) وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك -

প্রতিদান থাকিবে না। তারা দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করিবে, সবই মিছমার করিয়া দেওয়া হইবে।" (১)

অপর পক্ষে যাহারা সম্পদ সঞ্চয় এবং দুনিয়ার জীবনের প্রাচুর্য্য সংগ্রহের মধ্যেই সর্বক্ষণ লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষেও—"দুনিয়ার জীবনে তোমার হিস্যার কথা ভুলিও না,"—এই আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব হইবে না। কেননা, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এই হিস্যার বণ্টন সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন,ঃ—

ঃ সম্পদের মধ্যে তোমাদের হিস্যা শুধুমাত্র ঐ টুকুই, যেটুকু ব্যয় করিলে, সেইটুকুই সঞ্চিত হইয়া রহিল।'

কোন ব্যক্তির দৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন কিছুতেই নিবদ্ধ হউক না কেন, তা যদি জান্নাতুল ফেরদাউসও হয় এবং সেই বস্তুকেই যদি সে তার জীবন সাধনার লক্ষ্যস্থল হিসাবে স্থির করিয়া নেয়, তবে তার অন্তর—"এবং আল্লাহতা'লা যেমন ভাবে তোমার প্রতি এহ্ছান করিয়াছেন তুমিও তেমনিভাবে তাঁর বান্দাদের প্রতি এহ্ছান কর"—এই আয়াতের মর্মার্থ পর্য্যন্ত পৌছিতে সমর্থ হইবে না।

রাছুল মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর সম্মুখে এহ্ছান শব্দের ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন,—"হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,—এহ্ছান কি?

জবাব দিলেনঃ—এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ।"

যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'লা অনুগ্রহরাশী বর্ষণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাহার উপর সেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। শুকরিয়ার তরিকা হইতেছে,—সর্ব প্রথম নেয়ামত-দাতা

---

(১) من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون - اولئك الذين ليس لهم فى الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ০

আল্লাহর 'শান' সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার চেষ্টা করা। দুনিয়ার জীবনে যৎসামান্য যে নেয়ামতটুকু হাছিল হইয়াছে তার উপরে আরও যে অফুরন্ত নেয়ামত রহিয়াছে, যে গুলি অর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, সেইগুলি অর্জ্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, এই সম্পদে পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া না থাকা।

যে ব্যক্তির মধ্যে মহত্তর নেয়ামতরাশী হাসিল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তার অন্তরে সেই নেয়ামতের পরিচয় ক্রমে ক্রমে গভীরতর হইবে এবং সেই পথে মেহনত করার আগ্রহও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ইহাই হইতেছে শুকুরের হাকীকত এবং এই সম্পর্কে ইশারা করিতে গিয়াই কুরআন পাকে বলা হইয়াছে যে,–ঃ যদি শুকুর আদায় কর, তবে নেয়ামত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। (১)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তার মধ্যে শুকুর আদায় করার এই প্রক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে ভোগ-বিলাসের আধিক্য এবং দায়িত্ব প্রাপ্তির পর যুহদের জিন্দেগী গ্রহণ করিয়াও অস্থির থাকার মধ্যে যে মানসিক বিপ্লব লক্ষ্যনীয় ভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রকৃত শুকুর আদায় করার প্রকৃষ্ট পন্থাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার নেয়ামতরাশীর শুকুর সেই ব্যক্তিই পূর্ণরূপে আদায় করিতে পারে যে দুনিয়াকে ঐ সমস্ত লোকের মাধ্যমে চিনিতে পারিয়াছে, যাহাদের এই দুনিয়ার জীবনে কোন পদমর্য্যাদা নাই, কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিও নাই, কিন্তু জীবন-দৃষ্টি তাহাদের এত উচ্চ যে, সবকিছু হইতেই তাহারা বে-পরওয়া। যাহাদের অনেক কিছু আছে, তাহাদের ধারে কাছে যাওয়ার প্রয়োজন তাহারা কখনও অনুভব করে না। দুনিয়ার সম্পদের প্রতি, পদমর্য্যাদার প্রতি কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি কোন লোভও তাহাদের অন্তরে ছায়াপাত করিতে পারে না। দুনিয়াদারদের মোকাবেলায় তাহারা অফুরন্ত প্রভাব রাখে, আত্মমর্য্যাদা তাহাদের আকাশ চুম্বি।

দুনিয়ার সব কিছু হইতে যাহারা মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে তাহাদেরকে তিনটি ভাগ করা যায়।

---

(১) لئن شكرتم لا زيد نكم –

প্রথম স্তর হইতেছে ঐ সমস্ত লোকের, যাহারা দুনিয়ার ঝামেলা, দুনিয়াদারদের নীচতা, দুনিয়ার জীবনের অসারতা এবং অস্থায়ী জীবনের মোহে আবদ্ধ হওয়ার বিড়ম্বনা হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন। ত্যাগীগণের মধ্যে এই সমস্ত লোক সর্বনিম্ন স্তরের বলিয়া বিবেচিত। তবে গাফেল দুনিয়াপুরস্তদের তুলনায় এই স্তর অনেক উন্নত।

দ্বিতীয় স্তর হইতেছে ঐ সমস্ত লোকের, যাঁহাদের অন্তরদৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ার পর তাঁহারা অনুভব করিতে পারিয়াছেন যে, এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এখানকার ধন-সম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যদি সকল ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত পবিত্রও হইত, তথাপি আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় দুনিয়ার উপর তৃপ্ত হওয়া উৎকৃষ্টতর বস্তুর মোকাবেলায় নিকৃষ্টতর বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করারই নামান্তর। এই ধরণের অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের সম্মুখে আল্লাহর কালাম,–"এবং নিশ্চয় আখেরাত উত্তম ও স্থায়ী, (১)– পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহাদের বক্তব্য হইতেছে যে, যদি অস্থায়ী এই দুনিয়া স্বর্ণনির্মিত হইত আর আখেরাত হইত নিছক মাটির ঢিবি– তথাপি অস্থায়ী এই দুনিয়া চিরস্থায়ী আখেরাতের তুলনায় গ্রহণযোগ্য হইত না। বুদ্ধিমান মাত্রই ক্ষণস্থায়ী মহামূল্যবান বস্তুর মোকাবেলায় চিরস্থায়ী স্বল্পমূল্যের বস্তুকেই বেশী মূল্য দান করিবেন। কিন্তু আসলে যেহেতু দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীণ এবং আখেরাত চিরস্থায়ী এবং অমূল্য, তখন কোন বুদ্ধিমানের পক্ষেই তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য অমূল্য আখেরাতকে বরবাদ করার প্রশ্নই আসিতে পারে না।

তৃতীয় স্তর হইতেছে ঐ সমস্ত লোকের, যাঁহারা আরও একটু অগ্রসর হইয়া দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় হইতেই মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। "আল্লাহ সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী" (২) এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সেই পরম সত্বার তালাশেই সকল সাধনা নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন। সেই মহাপরাক্রমশালী পরম আকাংখিত সত্বার সন্তুষ্টির স্তরে অবস্থান করার মহাত্ম

---

(১) وللاخرة خير وابقى – (২) والله خير وابقى –

তাহাদের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবন সাধনার সেই চরম ও পরম পাওয়ার স্তর সম্পর্কে বাস্তবভাবে ওয়াকেফহাল হওয়ার পর তাঁহাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, জান্নাতের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে নাফছের পরিতৃপ্তি এবং ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার ছামান সম্পর্কেও খবর দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভোগ-বিলাস, খানা পিনা, আমোদ-আহলাদ প্রভৃতি এমন সব বিষয়ও সেখানে রহিয়াছে যে সবে চতুষ্পদ জন্তুর পক্ষেও আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। সুতরাং ভোগ-বিলাসে পূর্ণ জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও এক ধরণের জান্তব অনুভূতিই আর কিছু নয়। তাই এই শ্রেণীর লোকেরা জান্তব নীচতার স্তর হইতে উত্তরিত হইয়া ফেরেশতাদের দুনিয়ায় পা রাখিয়া অগ্রসর হইতে শুরু করিয়াছেন। ইহাদের বিদগ্ধ আত্মা সেই পরম সত্তার একান্ত সান্নিধ্য ছেজদা ও তছবীহর মধ্যেই পরম তৃপ্তির সন্ধান পাইবেন। এই স্তরই মানবরূপী কাফেলার শেষ মনজিল,— "তোমার রবের সান্নিধ্যই মনজিলের শেষ"(১)—এই আয়াতের মর্মার্থ। সেই পরম পাওয়া, মনজিলের পানে অবিরাম চলার সাধনা, যে চলার কোন শেষ নাই, যে আকাংখার কোন তুলনা নাই, সেই সাধনার আড়ালে এমন সব রহস্যাবলী লুকায়িত রহিয়াছে, যা বর্ণনা করার অনুমতি যবান বা কলম কাহারো নাই।

মাননীয় উজির মুজিরুদ্দীনকে আল্লাহপাক এমন তওফীক দান করুন, যেন তিনি পরিপূর্ণতার সেই স্তরে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত পরিতৃপ্ত না হন।

উপরোক্ত কথা কয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখার মত তওফীক হওয়ার জন্যও আমি দোয়া করি। কেননা, এই পথের প্রতিটি স্তর এমন সব সূক্ষ্ম বিষয়ে ভরপুর যা সাধারণ ভাবে উপলব্ধি করার মত আলেমই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সুতরাং এই বিষয়ের গভীরতা পর্য্যন্ত পৌঁছার মত জ্ঞানী লোক কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

জনাবের সঙ্গে বাগদাদে সাক্ষাত লাভ করার পর হইতে আমি শাম, হেজায, ইরাক প্রভৃতি এলাকা সফর করিয়াছি। সর্বত্রই আপনার অপরিসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ

(১) وان الى ربك المنتهى ٥

হইতে দোয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে আমি সবকিছু ছাড়িয়া একান্ত নিরিবিলির জীবন বাছিয়া নিয়াছি। সুলতানগণের দরবারে হাজিরা দেওয়া এবং পত্র যোগাযোগ করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার যবান ও কলম এই ব্যাপারে কঠিন সংযম পালন করিয়া আসিতেছে। এই অবস্থার মধ্যে অভ্যাসের বিপরিত আপনার নিকট এই পত্র প্রেরনের কারণ দুইটি।

প্রথমত ঃ আপনার ন্যায় সৎকর্মশীল মহৎপ্রাণ ব্যক্তির ওজারত পদে বরিত হওয়ার সংবাদে দেশবাসীর অন্তরে যে আনন্দ হিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে, তার ঢেউ লাগিয়া আমার কলমের সংযমের বাঁধও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনার সঙ্গে এই সময় সাক্ষাৎ করাই আমার পক্ষে সমিচীন ছিল, কিন্তু কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনের আদর্শ নষ্ট হওয়ার ভয়ে পত্রের মাধ্যমেই কর্তব্য সমাধা করিতে হইল।

দ্বীতিয়ত ঃ বর্তমানে এই এলাকায় অনেকগুলি সমস্যা পুঞ্জিভূত হইয়া গিয়াছে। জনাবের ওজারত লাভ করার পর এই শহরের শাসকও বাগদাদ হাজির হইয়া মোবারকবাদ পেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই ব্যক্তির আনুগত্য, কর্মদক্ষতা এবং ঈমানদারী সম্পর্কে আমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে, এই যুবা বয়সেই সে যেমন এবাদত ও তাকওয়া পরহেজগারীতে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দ্বারা হুকুমত বা প্রজাসাধারণের কোন প্রকার অকল্যাণ হওয়ার আশঙ্কা নাই, সেই জন্য শহরকে অরক্ষিত রাখিয়া বাগদাদ না যাওয়ার জন্য আমিই তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তার সেই হাজিরা না দেওয়ার বিষয়টিকেই কদর্থ করিয়া কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোক আপনার খেদমতে নানারূপ পত্র প্রেরণ করিতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। সেই কারণেই বোধ হয় নতুন হুকুমতের তরফ হইতে আজ পর্য্যন্ত তুসের শাসনকর্তার নামে কোন ফরমান আসিয়া পৌঁছিতেছেনা। উজির মোহতারাম! আপনার সঙ্গে আমার পুরাতন সম্পর্ক এবং পারস্পরিক আস্থার উপর নির্ভর করিয়া আপনি এই ব্যক্তির নিয়োগপত্র নবায়ন করিয়া বিনাদ্বিধায় ফরমান পাঠাইতে পারেন। এই ব্যক্তি পূর্ববর্তী ওজারতের সময়ে এই পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার সময় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। তার সততা, কর্মদক্ষতা এবং পারিবারিক মর্য্যাদার কথা বিবেচনা করিয়া

পূর্ববর্তী মহান উজির একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে এই দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। আপনিও আর দেরী না করিয়া ইহার নিয়োগের ফরমান প্রেরণ করুণ কেননা, দুদোল্যমান অবস্থার কারণে বর্তমান শাসনকার্য্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে।

স্মরণ রাখিবেন, তুস এমন একটি শহর যেখানে দ্বীনদার দরবেশ যাহেদ শ্রেণীর লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করিয়া থাকেন! ইহাদের নেক দোয়া কজবুত দুর্গের সমতুল্য। বর্তমানে এখানকার শাসন কার্য্য পরিচালকগণের মধ্যে কিছু উচ্চাভিলাসী লোক নানা স্বার্থের বশবর্তী হইয়া একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসাকাতর হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে স্বার্থের টানাপোড়েনে পড়িয়া সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িতেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র ফরমান জারী করিয়া এই খানকার আল্লাহ ওয়ালা সাধারন মানুষের আন্তরিক দোয়া লাভ করিতে সচেষ্ট হউন। সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ফিরিয়া আসিলে ঝরনাধারার ন্যায় সকলের নেক দোয়া সর্বদা আপনাকে স্নাত করাইতে থাকিবে।

আল্লাহ পাক মুসলমান, প্রজাসাধারনের নেক দোয়া কবুল করুণ। আমীন ॥

দ্বিতীয় পত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ পাক, বলেন, "সেই কঠিন দিন আসার আগেই তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের নির্দেশ মান্য কর; যে দিন আল্লাহর তরফ হইতে ফিরিবে না। সেইদিন তোমরা কোথাও আশ্রয় পাইবে না, আল্লাহর সেই নির্দেশ প্রতিহত করারও কোন উপায় থাকিবে না। যদি তারা অবাধ্যতা দেখায়, দেখাক। আপনাকে উহাদের রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করি নাই। আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

যেদিন ফিরিবে না, সেই দিন হইতেছে মৃত্যুর দিন। সেইদিন আক্ষেপ অনশোচনা কোন কিছুই কোন কাজে আসিবে না। বলা হইয়াছে, "আমার আজাব যখন তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, তখন আর কোন কিছুই তাহাদের কোন কাজে আসিবে না।

বুদ্ধিমান তাহারাই যাহারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া মৃত্যুর পর যে দুনিয়ায় আসিবে, সেই জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। অপরপক্ষে মুর্খ নাদান ঐ সমস্ত লোক যাহারা প্রবৃত্তির আনুগত্য করিয়া জীবনপাত করে।

মকবুল হওয়ার আলামত হইতেছে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ লাভ হওয়া। সর্বদা সেই পথের সাধনায় লিপ্ত থাকার মত মানসিক প্রস্তুতি বজায় থাকা। ঐ সমস্ত লোক দুনিয়ার জীবনে ততটুকুই সংগ্রহ করিয়া তৃপ্ত হয় যতটুকু ছামান একজন ঘোড়সওয়ারযাত্রী সঙ্গে নিয়া পথ চলে।

আখেরাতের পাথেয় হইতেছে, সর্বপ্রথম নিজের আত্মার ফরিয়াদ শ্রবণ করার শক্তি অর্জন করিয়া সেই ফরিয়াদের প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়া। অতঃপর আল্লাহর বান্দাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করা এবং প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হওয়া।

আজ আল্লাহর বান্দারা জালেমদের কবলে পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি সেই মযলুমদের ফরিয়াদ শ্রবণ করিয়া প্রতিকারার্থে অগ্রসর হইবে, উর্দ্ধজগতে তাহার উপাধী হইবে মুজিরুদ্দৌলা বা রাষ্ট্রের আশ্রয় দাতা। প্রকৃতপক্ষে খেতাব লকব উর্দ্ধজগতেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করিয়া তৎপ্রতি আমল করে এবং অন্যদিগকে সেই এলেম শিক্ষা দেয়, উর্দ্ধজগতে তার মর্য্যাদা হইবে অপরিসীম।"

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই তার অবস্থার অনুপাতে উর্দ্ধজগতে এক একটি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সেই নামই তার প্রকৃত নাম এবং তার অবস্থার সঠিক দর্পন হিসাবে বিবেচিত হইবে। দুনিয়ার উপাধী নিতান্তই সাময়িক ও মূল্যহীন।

স্বীয় আত্মার ফরিয়াদ শ্রবণ করা ও তার প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়ার অর্থ প্রবৃত্তির হামলা যথা লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতি ঘৃন্য প্রবণতা হইতে নিজের আত্মাকে হেফাজত করা।

জুলুম করিতে করিতে (সেই জুলুম স্বীয় আত্মার উপরই হউক বা অপর

লোকের উপরই হউক) মানুষ শয়তানের লস্‌করে পরিণত হইয়া যায়। আর বিবেক-বুদ্ধিরূপ খোদায়ী লসকর সেই শয়তানী লসকরের হাতে বন্দী হইয়া যায়! সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া শয়তানী ইচ্ছার খেদমত করিতে লাগিয়া পড়ে। প্রবৃত্তির আকাংখা পূরণ এবং ক্রোধ-কাম লোভের প্রেরণা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। যদি কেহ স্বীয় বিবেক বুদ্ধিকে শয়তানী লস্‌করের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হইয়া সাফল্য লাভ করিতে পারে, তবেই সে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার রবুবিয়তের মাহাত্ম অনুধাবন করার যোগ্য হয়।

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—"শয়তান যদি বনী আদমের অন্তরে স্থান লাভ না করিত, তবে তাহারা উর্দ্ধজগতের সকল মহাত্ম প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইত।"

যদি কেহ উপরোক্ত অপশক্তি গুলির প্রভাব হইতে স্বীয় আত্মাকে মুক্ত করাইতে পারে, তবে তাহার পক্ষেই কেবল এই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ হইতে পারে।

মাননীয় উজির! আপনার ব্যক্তিত্ব বর্তমান যুগে অনন্য। অন্যান্য আমীর-উমরাহ হইতে আপনার মর্য্যাদা স্বতন্ত্র। তাই সঙ্গতভাবেই আমি আশা করি যে, আপনি স্বীয় আত্মাকে সকল কু-প্রভাব হইতে মুক্ত করার ব্যাপারে যত্নবান হইবেন। আমি যেকথাগুলি বর্ণনা করিলাম, তার মর্ম উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট প্রজ্ঞা আপনার রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এতদসঙ্গে আশা করি, মৃত্যুর সেই সুনিশ্চিত প্রহরটি আসার পূর্বেই আপনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উর্দ্ধজগতের জন্য তৈরী করিয়া নিতে সমর্থ হইবেন। মৃত্যু প্রত্যেকের অতি সন্নিকটেই রহিয়াছে।

সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ শ্রবণ করা এবং সেই সবের প্রতিকার চেষ্টার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই দায়িত্ব প্রত্যেকের উপরই ওয়াজেব। বর্তমানে জুলুম নির্য্যাতন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমি অন্যায় অত্যাচারের এই দৃশ্য দেখিয়া প্রায় এক বৎসর পূর্বে তুস হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম, যেন জালেম শাসক সম্প্রদায়ের চেহারাও কখনও আর দেখিতে না হয়। জরুরী কাজে পুনরায় তুসে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইতেছি, জুলুম-

নির্য্যাতন আগের মতই অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনাতীত হইয়া উঠিয়াছে।

আপনি অনতিবিলম্বে সাধারণ মানুষকে এই অত্যাচারের যাঁতাকল হইতে মুক্ত করুন। কেননা আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার দুনিয়ার জীবনে অসম্মান এবং আখেরাতের জীবনে কঠিন আজাবের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। অত্যাচার অনাচার দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া জেহাদে আকবর, সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। যারা এই জেহাদে জয়যুক্ত হয়, তাহারা মর্য্যাদার দিক দিয়া রাজা বাদশাহর উপরে স্থান লাভ করে।

কেহ যদি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চায়, তবে তাঁহাকে সরল-সহজ জীবনের অনুসারী হইতে হইবে। জমকালো পোষাক পরিধানে অভ্যস্ত লোকেরা সেবামূলক কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে না। মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ আত্মম্ভরিতা এবং আরাম-প্রিয়তার আলামত। এই ধরনের লোক পুরুষের বেশে স্ত্রীলোক বৈ আর কিছু নয়।

কেহ যদি নিজেকে আচার-আচরণে অথবা বেশ-ভূষায় এমন স্তরে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয় যে, সাধারণ মানুষ তাহার সেবা করিতে লাগিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, সে অহংকার-আত্মম্ভরিতার বন্দীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই পর্য্যায়ে আসিয়া যেহেতু তাহার পক্ষে আর সাধারণ মানুষের সেবা করা সম্ভব নয়, সুতরাং সে জনগণের জন্য এমন কি নিজের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কিছু সংখ্যক লোক আছে, যাহারা সেবক বেশে উজিরদের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। উজিরে আজমের পক্ষে এই ধরণের লোকের সেবা ও আনুগত্য লাভে মর্য্যাদার কিছু নাই। কেননা ইহারা কখনও উজিরের সেবা করে না, ইহারা মাথানত করে নিজ নিজ লোভ ও উচ্চাকাংখার সম্মুখে। ইহাদের খেদমত উজিরে-আজমের প্রতি নিবেদিত নয়. প্রকৃত প্রস্তাবে স্ব-স্ব লোভ-লালসা এবং উজিরের তরফ হইতে যে সব নগদ স্বার্থ লাভ হয়, সেই সবেরই খেদমত করিয়া থাকে। উজিরকে ভুল ধারনার মধ্যে ডুবাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে ইহারা সম্মুখে বসিয়া তারিফ করে। বন্ধুত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদের বন্ধুত্ব কিন্তু তুচ্ছ কয়েকটি টাকার ভুরিতে

বাঁধা থাকে মাত্র। কয়টি মুদ্রা হাসিল করার উদগ্র লালসায় তাড়িত হইয়াই এই সমস্ত লোক বন্ধুত্বের তসবীহ মুখে নিয়া সর্বদা চারিদিকে ঘুর-ঘুর করিতে থাকে। যদি ঘুনাক্ষরেও জানাজানি হইয়া যায় যে, উজারতের এই পদ অন্য কাহারো হাতে চলিয়া যাইতেছে, তখনই দেখিবেন, রাতারাতি এই সমস্ত লোক চারিদিকে ছিটকাইয়া গিয়াছে। নতুন মনিবের তালাশে আপনার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে। আপনার প্রতি ইহারা যতটুকু আনুগত্য দেখাইতেছে, আপনার দুশমনের প্রতি আপনার চোখের সম্মুখেই এরচাইতে বহুগুণ বেশী আনুগত্য ও খেদমতের মহড়া দিতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

উপরোক্ত বাস্তব সত্যটুকু অনুধাবন না করিতে পারিয়াই যদি কেহ তোষামোদকারীদের মৌখিক তারিফ এবং সাময়িক ক্ষমতার দাপটের উপরই তার মর্য্যাদার আসন গড়িয়া তোলে তবে ধোকাবাজীতে পরিপূর্ণ এই দুনিয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত সম্মানজনক স্থান হিসাবেই বিবেচিত হইবে। অন্যদিকে যদি ভুয়া মর্য্যাদাবোধ এবং তোষামোদকারীদের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করিতে কেহ সক্ষম হয়, তবে এই দুনিয়ার সাময়িক ক্ষমতার দাপট তাহার দৃষ্টিতে জাহান্নামের অন্ধকার গহ্বর বলিয়া প্রতিয়মান হইবে।

ক্ষমতাবান কিছুসংখ্যক লোক এখনও আছেন, যাহারা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তথা রাজা-বাদশাহদের সুদৃষ্টি এবং সাময়িক অনুগ্রহকেই মর্য্যাদার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া বসে। অথচ যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাহারা অনুধাবন করিতে পারেন যে, এই ভিত্তি মাকড়শার জালের উপর ভিত্তি স্থাপনের চাইতে বেশী নির্ভরযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় এই দিকে ইশারা করিয়া দিয়াছেন। বলা হইয়াছে, "যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য অভিভাবকের স্মরণাপন্ন হয়, তাহাদের মিছাল হইল যেন কেহ মাকড়সার জালের উপর ঘর বাঁধিতে গেল। অথচ মাকড়সার জাল কত দুর্বল। হায় ইহারা যদি এই সত্য অনুধাবন করিতে পারিত!"

মর্য্যাদার সর্বাপেক্ষা মজবুত এবং স্থায়ী ভিত্তি হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং স্বাধীনতা। আত্মজ্ঞান বা মারেফাতের অর্থ হইতেছে দুনিয়ার ধোকা

ফেরেববাজী ও অসারতা এবং পাশাপাশি আখেরাতের প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠত্বের গভীরতা পর্য্যন্ত পেঁছিতে সক্ষম হওয়া। আর স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে নাফছের সকল প্রকার খাহেস হইতে মুক্ত হওয়া। এমন মুক্ত যে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা দুনিয়ার সকল বাদশাহও যদি একত্রিত হইয়া কাহারো সেবায় লাগিয়া যায়, তবুও তার মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে না। যদি সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়, তবুও তাহার পক্ষে অনুধাবন করা উচিত যে. প্রবৃত্তির জিন্দানখানা হইতে মুক্তি লাভ হয় নাই। দাসত্বের পূর্ণ অনুভূতি অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি এখনো অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল রহিয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে আত্ম নির্ভরতা এবং নিজের উপর পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয় নাই।

রাছুলে মকবুল (দঃ) হযরত আলীকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলিয়াছেন, ঃ মানুষ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে সচেষ্ট হয়। তুমি আকলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যের পথ তালাশ কর।"

এই হাদীছের মর্মার্থ হইতেছে, বুদ্ধি এবং চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার মিছাল সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কিমিয়ার বিদ্যা জানা আছে। সে স্বর্ণ রৌপ্য তৈরী করিতে জানে। আর আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা হইতেছে হাতে গনা কিছু টাকা নিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা। কেননা, বোধীর মাধ্যমে যে নৈকট্য লাভ করিতে চায়, সে প্রত্যেকটি বিষয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করে, সবকিছুর গভীরে পৌছার পর দুনিয়া তাহার দৃষ্টিতে মূল্যহীন আসার বস্তু হিসাবে ধরা দেয়। দুনিয়ার প্রতি সকল আকর্ষণ তার অন্তর হইতে স্বাভাবিকভাবেই দূর হইয়া যায়। স্বতস্ফূর্তভাবেই সে দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে পর্য্যন্ত চিন্তা এবং উপলব্ধি না আসিবে, সেই পর্য্যন্ত দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে না, দুনিয়ার বাঁধন তার পক্ষে পরিপূর্ণ রূপে ছিন্ন করা সম্ভব হইবে না। আর যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে মাওলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর হইবে না। শরিয়তের পরিভাষায় ইহাকেই "দীদার" বা প্রত্যক্ষকরণ বলা হয়।

যে সব লোকের সকল চেষ্টা সাধনার কেন্দ্র বিন্দু জান্নাত এবং হুর গোলমান লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহাদের পক্ষে আল্লাহর ওলীগণের কাতারে শামিল হওয়া সম্ভব হইবে না। এই সমস্ত লোকের পক্ষে আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়টি দুনিয়ার বুকে রাজা-বাদশাহর নৈকট্য লাভের সঙ্গে তুলনীয়। মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে যেভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা তাহাদের পক্ষে এরচাইতে বেশী অর্থবহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কিছু কামনা করে, সেই কাম্য বস্তুই তাহার প্রিয় পাত্রে পরিনত হইয়া যায়।

যেহেতু আল্লাহ তা'লা মাননীয় ওজিরকে পরিপূর্ণ বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে গভীর অনুধাবন শক্তি প্রয়োগ করিয়া, আল্লাহ তা'লার নৈকট্য হাছিল করা কর্তব্য। যেন তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞগণের কাতারে শামিল হইতে পারেন এবং মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় চকচকে জিনিষ দেখিয়া ধোকায় না পড়েন।

যে সব লোক দুনিয়াকেই সকল আশা আকাংখার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়া আখেরাত হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে তাহারা গাফেল এবং প্রকৃত সুস্থবুদ্ধির কাঙ্গাল। তাহাদের উপর প্রবৃত্তির তাড়না এমনভাবে চাপিয়া রহিয়াছে যে, দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগই তাহাদের সম্মুখে খোলা নাই।

যদি কাহারো বুদ্ধিই তাহাকে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার পথ হইতে সরাইয়া দেয়, তবে বুঝিতে হইবে, এর পিছনে দুইটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথমতঃ হয়ত সে তাহার কোন নাফছানী খাহেসের দড়িতে এমনভাবে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে যে, ধন-সম্পদ এবং পদমর্য্যাদার লোভ ত্যাগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। এই রোগের প্রতিকার হইতেছে, সৎসাহস এবং সাধনায় উন্নত লোকদের পথ অবলম্বন, ক্ষুধিত প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখা, উচ্চাকাংখা এবং উন্নততর চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হইয়া ইতর নীচদের স্তর হইতে উত্তরিত হইয়া যাওয়ার চিন্তাধারা সৃষ্টি করা।

দুনিয়ার আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করার জন্য এতটুকু চিন্তাধারাই যথেষ্ট

যে, এই মোহ নিতান্তই ক্ষনস্থায়ী। এখানকার কোন কিছুই চিরদিন থাকে না। কাহারো ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই দুনিয়াকে উপভোগ করা সম্ভব পর হয় না। সুতরাং এমন একটি অসার বস্তুর পিছনে অমূল্য মানব জীবনের সকল সাধনা নিয়োগ করা কেমন করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে?

দ্বিতীয় কারণ ঃ—যা তাহাকে আখেরাতের রাস্তা হইতে ফিরাইয়া রাখে তাহা হইতেছে, আখেরাতের ব্যাপারে সোবা-সন্দেহ কিংবা কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হইয়া সেই লোক হয়ত হাবু-ডুবু খাইতেছে। তার আকল অন্তর্দৃষ্টি তাহাকে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না।

আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা ও অনুভূতি সঠিক পথে পরিচালিত করার পরও লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে সক্ষম না হওয়া কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কেননা বহুলোকের মনেই খোদ আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বের ব্যাপারেও সোবা-সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। চিন্তা করিয়াও তাহারা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।

এই শ্রেনীর লোকের চিকিৎসা হইতেছে, সর্বপ্রথম তাহাকে অন্তর হইতে এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া ফেলিতে হইবে যে, সে যা চিন্তা করিতেছে বা অনুধাবন করতে সমর্থ হইতেছে, ইহাই শেষ কথা এবং এর পর জ্ঞান বা যুক্তির আর কোন স্তর নাই। নিজের জ্ঞান ও চিন্তার অহমিকা ত্যাগ করার পর তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কুরআনে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে,—যদি কোন বিষয়ে জানার অভাব হয় তবে জ্ঞানীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নাও।" (১)

একজন চিকিৎসক যেমন ভাবে দলীল-প্রমানের মাধ্যমে এই কথা অবগত আছেন যে, মানুষের মধ্যে যে প্রাণ রহিয়াছে তা ক্ষণস্থায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের পর উহা আর শরীরের মধ্যে থাকিবে না, এবং এই শরীর ও প্রাণকে কিছুকাল রক্ষা করার জন্যও আবার নিয়মিত খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন। অপর পক্ষে "বিষ" নামক এমন একটি বস্তুরও অস্তিত্ব আছে, যা মানুষের প্রাণ নাশ করিয়া

---

(১) فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -

থাকে। ঠিক তেমনি শুধু খবর বা বর্ণনার ভিত্তিতেই নয়, দলীল প্রমাণের মাধ্যমেই আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি যে, মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী কোন কিছুই সেই অবিনশ্বর আত্মার স্পর্শলাভ করিতেও সক্ষম নয়। মানবীয় অপ-প্রবণতা এবং নাফছের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়াই কেবল রুহ মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। তার প্রকৃত সৌভাগ্য নির্ভর করে মহামহিমান্বিত পরম প্রিয় মাওলার সত্যিকারের পরিচয়ের মধ্যেই। মুক্তি এবং সৌভাগ্য এক জিনিষ নয়। মুক্তির পরও সৌভাগ্যের স্তর বহু উর্দ্ধে।

এই সমস্ত বিষয় কবির কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া বা বক্তার যাদুকরি বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। বর্ণাঢ্য বর্ণনার মাধ্যমে এই সমস্ত সুক্ষ্মবিষয় অনুধাবন করার প্রচেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। একমাত্র ছহীহ দলীল-প্রমাণ এবং শুদ্ধ অনুভূতির মাধ্যমেই এই সমস্ত বিষয় পর্য্যন্ত পেঁাছা সম্ভব। কেননা, হাকিকতের স্তরের এই শরাব পান করিয়া বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই নেশাগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির কাজ নয় এই বিষয় অনুধাবন করা।

অতএব উজিরে আজমের পক্ষে এতটুকু প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তির প্রয়োজন যেন তিনি ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, আখেরাতের সিরাতে মুস্তাকীম হইতে তাঁহাকে কোন সব কারণে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। বিষয়টি গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া এই রোগের চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য। যেন সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ শ্রবণ এবং তার প্রতিকার করিতে সমর্থ না হইলেও অন্ততঃ আত্ম সংশোধন করার সুযোগ তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। ছালাম!

তৃতীয় পত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—"যদি কেহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তবে তোমরা সেই অনুগ্রহের উত্তম প্রতিদান দিও।"

অপ্রিয় হক কথা ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রশস্ত অন্তরের পরিচায়ক। মাননীয় উজির এই কারণেই নেক দোয়া পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ রাব্বুল-

আলামীনের দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করিতেছি, তিনি আপনাকে প্রকৃত সৌভাগ্যের হাকীকত সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত হওয়ার এবং সেই সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হওয়ার তওফীক প্রদান করুণ।

প্রকৃত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে অন্যের উপদেশ শ্রবণ করে এবং সেই সমস্ত কথার তিক্ততা হজম করিয়া সেই উপদেশের মূল্য প্রদান করে। অবশ্য তিক্ত উপদেশ বরদাশ্ত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই সৌভাগ্য হইতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়াছেন, তিনি ছিলেন উজির তাজুল-মুলক। কেননা, নেজামুল মুলক এর দুঃখজনক পতনের ঘটনা তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছিল যে, এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু তিনি শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বরং মনে মনে স্থির করিলেন যে, নেজামুল মুলক বয়সে অভিজ্ঞতায় তাঁহার চাইতে খাট ছিলেন তাই দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত উজারতের মসনদে সমাসীন থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্থান সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বয়স প্রভৃতিতে সেই ত্রুটি সারিয়া উঠার পক্ষে অসুবিধা হইবে না। কিন্তু ভাগ্যের অখণ্ডনীয় কঠোর হস্ত তাঁহার সেই অহঙ্কারের সকল নেশা অল্পদিনের মধ্যেই কর্পূরের ন্যায় উড়াইয়া নিয়া গেল। অতঃপর মজদুল মুলক উজির হইলেন। কিন্তু তিনিও পূর্ববর্তীদের পরিণতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বরং মনে মনে এমন একটা ধারণায় উপনীত হইলেন যে, নেজামুল মুলক এর গুণগ্রাহী কর্মচারী এবং অনুচরেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাজুল মুলক এর বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে অনুরূপ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দক্ষতার সহিত কিছুকাল ওজারত চালাইলে পর সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু দেখা গেল, কালের কুটিল প্রবাহ তাঁহাকে ক্ষমা করিল না। খুব শীঘ্রই তাঁহার সকল আশা-আকাংখার ইমারত ধ্বসিয়া পড়িল। কুরআনের ভাষায়—

ঃ তোমাদিগকে কি আমি এতটুকু বয়স দেই নাই, যে সে সময়সীমার মধ্যে উপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং আমার তরফ হইতে কি সতর্ককারী আসিয়া তোমাকে সতর্ক করে নাই?"

অতঃপর মুরাইয়্যেদুল-মুলক এর পালা আসিল। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিন-তিনটি টাটকা ঘটনা তাঁহাকে সাবধান করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনিও সেইগুলি হইতে কোন প্রকার নছীহত গ্রহণ করিলেন না। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, পূর্ববর্তী উজিরগণের কেহ বংশ কৌলিন্যের দিক দিয়া ওজারতের যোগ্যই ছিলেন না, তাই এত তাড়াতাড়ি তাঁহাদের উপর বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। উচ্চ বংশমর্য্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে দক্ষতার সহিত ওজারতের দায়িত্ব পালন করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হইবে না। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁর সেই অহঙ্কারও ধুলায় মিলাইয়া গেল। তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিতেও মোটেই দেরী হইল না।

বর্তমানে আপনার পালা আসিয়াছে। আপনার প্রতিও আল্লাহর তরফ হইতে এইরূপ সতর্কবাণী আসিতেছে যে,—"এই সমস্ত ঘটনা কি তাহাদিগকে কোনই উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দেয় নাই যে, ইতিপূর্বে কত জনপদের সুখী লোকদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যারা তাহাদের বাড়ীঘরে চলাফিরা করিত। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানদের জন্য উত্তম নিদর্শন রহিয়াছে।" (১)

কুদরতের তরফ হইতে আপনার প্রতিও অনুরূপ ইশারার মাধ্যমে বলা হইতেছে যে,—"হে বুদ্ধিমান উজির! কোন অবস্থাতেই প্রকৃত জ্ঞানী সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন না। যারা বুদ্ধির চর্চা করে, তাহাদের পক্ষে কালের কুটিল প্রবাহের মধ্যে পদে পদেই শিক্ষনীয় বিষয় থাকিয়া যায়। আপনার পূর্বে যাঁরা অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাহারা বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াই সাফল্য লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের কি পরিণতি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখুন। দেখিতে পাইবেন,—"তারা কত সুন্দর উদ্যান, ঝরনা, শষ্যক্ষেত্র এবং বিশাল প্রসাদরাজি রাখিয়া গিয়াছে। কত সম্পদই না ছিল এই সবের মধ্যে যা তারা ভোগ করিত! এমনি ভাবেই আমি এক সম্প্রদায়ের

(১) اولم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون
فی مسا كنهم - ان فی ذالک لا يت لا ولی النهی -

সম্পদ অন্যদের হাতে দিয়া দেই। তাহাদের সেই পরিনতিতে আকাশ কিংবা জমিন কেহই ক্রন্দন করে নাই, তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হয় নাই! (১)

সুতরাং সময় থাকিতে আপনি নিজের অবস্থার কথা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করুণ। যদি পূর্ববর্তীদের মতই আপনিও একইপথ অবলম্বন করেন, তবে ভাবিয়া দেখুন কি জবাব দিবেন?—"তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখ না, কয়েক বৎসর তাহাদিগকে ভোগ করার সুযোগ প্রদান করি, তারপরই অঙ্গীকার কৃত সেই কঠিন মুহুর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। যে নেয়ামত তারা ভোগকরিত, সেইদিন তা তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না।"

আপনার ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, যে ধরণের বালা-মুছিবতের মধ্যে আপনি ঘেরাও হইয়া আছেন, ইতিপূর্বে আর কোন উজির এমন বিপদগ্রস্ত ছিলেন না। বর্তমানে যেরূপ জুলুম-নির্য্যাতন ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পূর্ববর্তী আর কোন উজিরের আমলে এমনটা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আপনি জুলুম না পছন্দ করিলেও মনে রাখিবেন, হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, আল্লাহ তা'লা হাশরের দিন জালেমদের নিকট কৈফিয়াত তলব করার সময় তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্টদেরকেও রেহাই দেওয়া হইবে না।

খুব ভালভাবে এই কথা মনে রাখিবেন যে, আশপাশে যারা আছে তাহাদের কাহারো আপনার জন্য চিন্তা করার সময় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফিকিরে অস্থির আছে। তাই নিজের চিন্তা আপনাকেই করিতে হইবে। সকলের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া দ্বীন-দুনিয়ার সৌভাগ্য হাছিল করার জন্য নিজেই সচেষ্ট হউন। যদি মনে করেন যে, দুনিয়ার জীবনে শান্তি লাভ সম্ভব নয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টা আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত করুন।

আমার জানামতে জুলুম প্রতিরোধের চাইতে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করার আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নাই। সারাদেশ আজ জালেমদের অবাধ

(১) كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة
كانوا فيها فاكهين - كذالك واورثنا قوما آخرين - فما بكت
عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ٥

বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আমার এই এলাকা জালেমদের খপ্পরে পড়িয়া সাধারণ মানুষের হাড় পর্য্যন্ত চূর্ণ হইতে চলিয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করিতেছে। সেই বৰ্দ্ধিত রাজস্ব সরকারী তহবিলে কখনও জমা হয় না, নিজেরাই গ্রাস করিয়া থাকে। দরিদ্র জনসাধারণ ইহাদের ভয়ে মুখ খুলিতেও সাহস করে না। নিরবে নির্মম শোষণ সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া বেচারাদের সম্মুখে আর কোন পথ খোলা নাই। আপনি অবিলম্বে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে অগ্রসর হউন।

অতীতে যা কিছু হইয়া গিয়াছে, তার ক্ষতিপুরণ সম্ভব না হইলেও আপনার শাসনামলে যাহাতে ঐ সমস্ত শোষক জালেমদের উচিত শিক্ষা হয়, তৎপ্রতি আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার প্রাণভরা আশা, আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই এই নির্যাতনের মূল উৎপাটন করা সম্ভব। জালেম শোষকদের উদ্ধত মস্তক চূর্ণ করিয়া আপনিই নিরীহ শোষিত প্রজাসাধারণের জীবনে শান্তির স্নিগ্ধ পরশ বুলাইতে সক্ষম। সে মতে অনতি-বিলম্বে আপনি একটা ফরমান জারী করিয়া দেশবাসীর সহায়তায় অগ্রসর হউন। মনে রাখিবেন, এই সব দরিদ্র মুসলমানদের নেক দোয়ার মাধ্যমেই আপনার ওজারতের মসনদ সকল বিপদ-আপদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। শাসক কর্তৃপক্ষের জন্য দরিদ্র প্রজাসাধারণের নেক দোয়ার চাইতে উত্তম সম্পদ আর কিছুই হইতে পারে না।

আল্লাহ তা'লার দরবারে দোয়া করি তিনি মাননীয় উজিরকে দ্বীন-দুনিয়ার সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করুণ। সর্বদা যেন আপনার প্রতি এহছান ও মেহেরবাণীর বারিধারা অবিরাম বর্ষিত হইতে থাকে। আমীন!! আপনার প্রতি ছালাম।

চতুর্থ অধ্যায়

আমির-ওমরাহ এবং দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তাগণের প্রতি লিখিত পত্রাবলী

প্রথম পত্র

মুঈনুল-মুলককে লিখিত

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তা'লা বলেন,—"আখেরাতের সেই আবাসস্থল আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য সুসজ্জিত করিয়াছি, যাহারা দুনিয়ার জীবনে অসংগত উচ্চাকাংখার বশবর্তী হয় নাই, বিপর্যায়ও সৃষ্টি করে নাই। উত্তম পরিণাম মোত্তাকীগণের জন্যই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।" (১)

আখেরাতের মুক্তি দুইটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে। এক,—অন্যায় উচ্চাকাংখার বশবর্তী না হওয়া এবং দুই,—ফাছাদ সৃষ্টি না করা। যে সব লোক রাজ্যশাসনের জন্য আকাংখিত হয়, নিঃসন্দেহে তাহারা উচ্চাকাংখী এবং উদ্যমশীলও হইয়া থাকে। তবে অসঙ্গত উচ্চাকাংখা অধিকাংশ সময়ই লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে না।

অপরদিকে যাহারা মূর্খদের ন্যায় সর্বদা ভোগ-বিলাস এবং আমোদ-স্ফূর্তিতে মশগুল থাকে, উহাদিগকেই বিপর্যায় সৃষ্টিকারী নামে অভিহীত করা হইয়াছে।

নাজাতের শর্ত পূর্ণ না করিয়া নাজাতের আশা করা আত্মপ্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উপরোক্ত দুইটি বিষয়কে নাজাতের পথে প্রধান অন্তরায় মনে না করা কুরআন শরীফকে সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর। আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া বদবখতীর রাস্তা বাছিয়া নেওয়া

---

(১) تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ○

বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে আসক্ত হইয়াও আখেরাতে নাজাতের আশা পোষণ করে সে হয়ত মনে মনে এইরূপ আশা করে যে, আল্লাহ তা'লা পরম দয়ালু, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তার ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ পাক নেককার বান্দাদের জন্য পরম দয়ালু, অনাচারীদের বেলায় নয়। কেননা, সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে ঃ—

ঃ সৎকর্মশীলগণ অবশ্যই নেয়ামতের মধ্যে থাকিবেন এবং পাপীরা নিতান্ত যন্ত্রনাদায়ক জাহান্নামে।'' (১)

অনেকে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে যে, আগামীতে তওবা করিয়া নেওয়া যাইবে। এইরূপ লোকেরা ভালভাবেই জানে যে. শয়তান তাহাদিগকে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একইভাবে আগামী দিনের ওয়াদার মধ্যে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। এই ধোকায় পতিত হইয়াই তাহারা তওবা করিতে পারিতেছে না। বিগত বৎসরগুলিতে যদি শয়তান তাহাদিগকে আগামী দিনের ধোকা দিয়া তওবা হইতে সরাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে সামনের আর কয়েকটি বৎসর যে সে এই ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিবে না, তা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় কিরূপে ?

অনেকে মনে করেন, তাহার মৃত্যুর সময় আসিতে এখনও অনেক দেরী। মনে হয়, মওতের ফেরেশতার সঙ্গে যেন তাহারা কোন চুক্তি রহিয়াছে।

এই সমস্ত লোক চিন্তা করিয়া দেখে না যে, "আজ ও কালের'' ধোকায় পতিত করিয়া শয়তান কত মানুষকেই সর্বনাশের সর্বশেষ স্তরে পেঁছাইয়া দিয়াছে ! বিশেষতঃ শেষ বয়সে এই ধরণের মনোভঙ্গী গাফলতের এবং বুদ্ধি বিপর্যায়ের চুড়ান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এইরূপ মনোভাবই চরম দুর্ভাগ্যের কারন হয়। আল্লাহ তা'লা সাবধান করিয়া বলিয়াছেন,—"অনেক জনপদে আমার পরম আজাব এমন হঠাৎ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, যখন তার অধিবাসীগণ নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। এই সব জনপদের অধীবাসীগণ মনে করে যে, দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা খেলা-ধুলায় মত্ত, তখন আমার আজাব

---

(১) ان الابرار لفى نعيم و ان الفجار لفى جحيم ٥

নামিয়া আসিবে। আল্লাহ তা'লার প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে ইহারা কি নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে ? অথচ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তদের দল ছাড়া আর কেহই আল্লাহর আজাব হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারে।"

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকেই আত্মবিস্মৃতির নিদ্রা হইতে জাগ্রত করুণ। বিশেষতঃ মুঈনুল মুল্‌ক্‌কে সুক্ষ্মভাবে সাবধান করিয়া দিন। সম্প্রতি আপনার জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে আপনার সম্পর্কে এমন কিছু কথা আমি শুনিতে পাইয়াছি, যেগুলি আখেরাতের জীবনে অত্যন্ত বিপদের কারণ হইবে। কথাগুলি শোনার পর হইতে আমি ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার পক্ষে অন্তর দিয়া দোয়া করা, মুখে তাম্বি করা এবং কলমের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা ব্যতীত আর কিই বা করবার আছে ? যদি আপনি আমাকে আপনার ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, বিশেষতঃ আপনার নিজের অন্তরে যদি কোন উদ্বেগ সৃষ্টি না হইয়া থাকে, তবে শুনুন, আমি দিদ্দে'শ দিতেছি, সবগুলি অনাচার এক সঙ্গে ত্যাগ করা যদি সম্ভব নাই হয়, তবে শরাব পান করা এই মুহুর্তে ত্যাগ করুণ !

মনে রাখিবেন, জুলুম অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ধরণের গোনাহ একবার সংযুক্ত হইয়া যায়, তবে মৃত্যুর আগে উহার কবল হইতে নিস্তারলাভ করা সম্ভবপর হয় না। এই বৃদ্ধ বয়সে মদ্য পানের অভ্যাস কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নয়। উজির নিজামুল-মুলক বার্দ্ধক্যে পদার্প'ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রকার পাপাচার হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি তওবার উপর দৃঢ় ছিলেন। এমনকি তিনি বাদশাহর দরবারে পর্য্যন্ত শরাব এবং অন্যান্য অনাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, খোরাসানের বাদশাহ আসমান জমিনের বাদশাহর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি জবাব দিবেন ? তিনি যেহেতু সত্য অন্তরে তওবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই জন্য পূর্বদেশের সর্ব-প্রধান নরপতিকে পর্য্যন্ত তিনি সর্ব প্রকার বদভ্যাস হইতে মুক্ত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন।

বন্ধুত্বের যা হক ছিল, আমি তা আদায় করিয়া দিলাম। বিবেচনা করা না করা আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। আল্লাহ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

দ্বিতীয় পত্র

সাআদাত খানকে লিখিত

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,—"এমন কোন বস্তু নাই যার অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার নিকট মওজুদ নাই। আমি নির্দ্ধারিত পরিমাণে তা নাযিল করিতে থাকি।"(১)

দুনিয়ার সমস্ত নরপতির ধনভাণ্ডারই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল বাদশাহর বাদশাহ যিনি, তাঁহার সকল ভাণ্ডারই সীমাহীন, অফুরন্ত, অগনিত। তাঁহার সেই অগনিত ভাণ্ডারের মধ্যে একটি হইতেছে সৌভাগ্যের এবং আর একটি দুর্ভাগ্যের। এই উভয় ভাণ্ডারই গায়বের পর্দা দ্বারা আবৃত। আবার দুইটি ভাণ্ডারের দুইটি চাবী রহিয়াছে। একটি চাবীর নাম পূণ্য এবং অন্যটির নাম পাপ। এই দুইটি চাবীই আবার সর্বজ্ঞাতা মহান সত্বার অপর দুইটি ভাণ্ডারের মধ্যে রক্ষিত। এর একটির নাম তওফীক এবং অপরটির নাম বঞ্চনা। আবার তওফীক এবং বঞ্চনার মূল বিষয়টি গায়েবের অন্য ভাণ্ডারে লুকায়িত রহিয়াছে। তার একটিকে বলা হয় 'রেযা' ও তসলিম বা সন্তুষ্টি ও আত্ম-সমর্পণ এবং অপরটিকে বলা হয় ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি। সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টিও আবার এমন দুইটি ভাণ্ডারের মধ্যে সংরক্ষিত যে পর্য্যন্ত সিদ্দীক এবং উচ্চ শ্রেণীর হাক্কানী উলামা ব্যতীত সাধারণ মানুষের এমন কি বিশিষ্ট জ্ঞানী-গণের ধারনাশক্তি ও পৌঁছিতে সক্ষম নয়। এই মাকাম সম্পর্কে কোন বর্ণনা প্রদান অথবা ব্যাখ্যা দেওয়াও সাধারণ আলেম বা সাধকগণের পক্ষে সম্ভব পর নয়। একমাত্র সেই সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব যাঁহাদের সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হইয়াছে যে,—"নিশ্চয় ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের সম্পর্কে পূর্ব হইতেই পূণ্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে।" (২)

---

(১) وان من شيء الا عندنا خزاينه وما ننزله الا بقدر معلوم ٥

(২) ان الذين سبقت لهم منا الحسنى ٥

দ্বিতীয়ত ঃ ঐ সমস্ত লোকের পক্ষেই এই খাজানা সম্পর্কে কিছু বলা হয়ত সম্ভব, যাঁহাদের সম্পর্কে খবর দেওয়া হইয়াছে যে,—"ইহাদের অধিকাংশ লোকের উপর আল্লাহর বাণী পূর্ণ হইয়াছে।" (১)

উপরোক্ত দুইটি আয়াতেই যে গূঢ় রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা তকদীরের রহস্যময় অধ্যায়। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা সমিচীন ব্যাপার হইতেছে কিছু না বলিয়া বা না শুনিয়া সম্পূর্ণ বোবা ও কালা সাজিয়া থাকা। কেননা, তকদীর আল্লাহ তা'লার এমন এক রহস্য যা প্রকাশযোগ্য নয়। এই রহস্যজগতের আড়ালে এমন আরও এক রহস্য জগত রহিয়াছে, যা উপরোক্ত সবগুলি খাজানা বা ভাণ্ডারের উৎসমূল। সেই জগত সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করার মত ভাষা নাই। খোদ রাছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম উপরোক্ত রহস্যজগতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে যাইয়া প্রথমে বলিয়াছেন,—"আয় আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার আজাব হইতে পানাহ চাই।" (২)

এই স্তর হইতে উন্নীত হইয়া বলিয়াছেন,—"আয় আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ-গজব হইতে পানাহ চাই" (৩)। এই স্তর হইতে পরবর্তী স্তরে আসিয়া বলিয়াছেন,—"আয় আল্লাহ! আমি তোমার মাধ্যমেই তোমার না-রাজী হইতে পানাহ চাই।" (৪) এরও পরবর্তী স্তরে যখন উন্নীত হন, তখন তাঁহার পবিত্র যবান হইতে বাহির হইয়া আসে,—"আমি তোমার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি যে ভাবে তোমার প্রশংসা করিয়াছ, তুমি তেমনি। (৫)

---

(১) لقد حق القول على اكثرهم ٥

(২) اعوذ بعفوك من عقابك ٥

(৩) اعوذ برضاك من سخطك ٥

(৪) اعوذ بك منك ٥

(৫) لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ٥

—"আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি হইতে পানাহ চাই,"—এই মাকামই হইতেছে উলামাগণের শেষ মাকাম। তাঁহারা এই পর্য্যন্তই পৌঁছিতে সক্ষম হন। তার পরবর্তী স্তরে নবীগণ ব্যতীত আর কাহারো পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই স্তরের পরে এমন আরও একটি স্তর রহিয়াছে, যেখানে ওলী-আওলিয়া এমনকি নবী-রাছুলগণের পক্ষেও পৌঁছা সম্ভব নয়। নবী ছিদ্দীকগণ সেখানে পৌঁছিলে পর এক বিস্ময়ের জগতে হারাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। সেখানে সকলেই এশ্ক এবং শওকের আগুনে ভস্মীভূত হইতে থাকা ছাড়া কোন কিছু অনুধাবন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাঁহাদের যবান হইতে শুধু বাহির হইয়া আসিবে, "ছুববুহুন্ কুদ্দুসুন" এর তসবীহ্! খোদ হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম সেই মাকাম প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—"তোমার প্রশংসাবাদ করার সাধ্য আমার নাই, যে ভাবে তুমি তোমার প্রশংসা প্রকাশ করিয়াছ, তুমি তেমনি।"

শুধু তাই নয়, সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, "সেই মাকাম অনুধাবন করার জন্য অগ্রসর হইয়া শুধু বিস্ময় আর অপারগতার অন্ধকারে ডুবিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।"

সংক্ষেপে সকল বাদশাহর বাদশাহের অফুরন্ত খাজানার এই হইতেছে সামান্য পরিচয়। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য হীরা জাওয়াহেরাতের যে ভাণ্ডার থাকে, সেইগুলি দোজখের চাবী ব্যতীত আর কিছু নয়। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "দুনিয়ার দাসেরা, দীনার-দেরহামের পূজারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হইবে, "দোজখের চাবী যাহারা বহন করিয়াছে তাহাদের তালিকা বাহির কর।" এই তালিকায় যাহাদের নাম রহিয়াছে, একে একে উহাদিগকে হাজির কর।" হায়! সেই তালিকায় যদি সাআদাত খানের নামও আসিয়া যায়, তবে সেইদিন পূর্বদেশের মহাপ্রতাপান্বিত সুলতান বা তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত উজীর বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিতে পারিবে না। বরং সেইদিন তাঁহারাও নিঃসন্দেহে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া যাইবে।

তৃতীয় পত্র

[জনৈক বিশিষ্ট আমিরের উদ্দেশ্যে লিখিত। সদকার তাৎপর্য্য এবং সদকা দানের সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে আলোচনা।]

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার দীর্ঘ অসুস্থতা, চিকিৎসকগণের ব্যর্থতা এবং ভুল ব্যবস্থা-পত্র প্রদানের দরুণ আপনার কষ্ট ভোগের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিতেছি। এই অবস্থায় মনে রাখা দরকার যে, যে স্রষ্টিকর্তা রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রোগের চিকিৎসা-বিধিও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

সাধারণভাবে অবশ্য লোকেরা মনে করে যে, চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্র অনুযায়ী কোন ঔষধবিক্রেতার দোকান হইতে ঔষধ কিনিয়া ব্যবহার করাই রোগ আরোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আসলে কিন্তু এই ধারনাটি ভুল। সকল চিকিৎসার জন্য রোগীর অন্তরে উপযুক্ত চিকিৎসক সম্পর্কে ইশারা সৃষ্টি হওয়া দরকার। আবার চিকিৎসকের অন্তরেও সেই রোগের স্বরূপ এবং তার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ঠিক ঔষধ, তার মাত্রা, সেবনবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে এলহাম হওয়া জরুরী। কেননা, রোগ নিরুপণ. তার জন্য উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচন এবং সেবনবিধি এই তিনটি বিষয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হইয়া থাকে।

যথার্থ চিকিৎসা বিধান এবং চিকিৎসকের অন্তরে নির্ভূল ঔষধ নির্বাচনের যে ইশারা আসিয়া থাকে, তা কোন দোকানে কিনিতে পাওয়া যায় না। উহা এমন এক জগতের জিনিষ, যার রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করার চাবী উর্দ্ধজগতে ফেরেশ্তাগণের ভাণ্ডারে সুরক্ষিত থাকে। দুনিয়ার মানুষের প্রত্যেক ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষে যে পথ-নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দেয়, তা ফেরেশতা-জগতের সেই সুরক্ষিত খাজানা হইতেই সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

কুরআনে পাকে এই সম্পর্কে ইশারা প্রদান করিয়াই বলা হইয়াছে,—"কোন মানুষের পক্ষেই সরাসরি অবশ্য আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। আল্লাহর তরফ হইতে ইশারার মাধ্যমে, কোন নবী-রাছুলের মারফতে অথবা

পর্দার আড়াল হইতেই আল্লাহর ইশারা লাভ করা সম্ভব। তাই তাঁর তরফ হইতে প্রেরীতদের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা প্রয়োজনীয় ইশারা প্রদান করা হইয়া থাকে। তিনি নিঃসন্দেহে মহামহিম, মহাপ্রাজ্ঞ।"

আল্লাহর তরফ হইতে ফেরেশতা-জগতের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইশারা আল্লাহ ওয়ালাগণের দোয়ার মাধ্যমেই কেবল লাভ করা যাইতে পারে। কেননা, ইঁহাদের নেক দোয়া এবং আন্তরিক আকুতি যে বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ হয়, আল্লাহর তরফ হইতে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'লা এই দিকে ইশারা করিতে গিয়াই বলিয়াছেন,—'আমার নিকট সর্ব বিষয়েরই অফুরন্ত ভাণ্ডার সুরক্ষিত রহিয়াছে, তন্মধ্য হইতে সবকিছুই নির্দ্ধারিত পরিমাণে নাজিল করা হইয়া থাকে।''

আল্লাহ ওয়ালাগণ বিশেষতঃ যাঁহারা নিজদিগকে আল্লাহর পথেই নিয়োজিত রাখেন, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই তাঁহাদের আন্তরিক দোয়া লাভ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত নেক দোয়া আলমে মালাকুতের তরফ হইতে ফেরেশ্‌তাগণের ইশারাপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দেয়। রোগীর পক্ষে যোগ্য চিকিৎসক নির্বাচন এবং চিকিৎসকের পক্ষে যথার্থ ঔষধ নির্বাচনের নির্ভরযোগ্য পন্থাই হইতেছে ফেরেশতা-জগতের গায়েবী সাহায্য লাভ। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফের তাৎপর্য্যও ইহাই। হাদীছে আসিয়াছে—"তোমরা সদকার মাধ্যমে রোগ-শোক দুর করার চেষ্টা কর।"

আল্লাহ ওয়ালাগণের আন্তরিক আকুতি আলমে-মালাকুতকে নাড়া দিয়া সেখান হইতে ফয়েজ লাভ করার উপযোগী হয় যে কারণে তৎপ্রতিও আল্লাহর কিতাবে ইশারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ-সাগরের বারিবিন্দুই ফেরেশতাজগত বা আলমে-মালাকুতের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হইয়া থাকে। কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে,— "আপনাকে রুহ সম্পর্কে তাহারা প্রশ্ন করিতেছে। ইহাদের বলিয়া দিন, রুহ আমার নির্দ্দেশেরই অন্তর্গত বিষয় মাত্র।" (১)

---

(১) يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي -

রুহ এবং আলমে-মালাকুতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক এই প্রসঙ্গটি এমন গভীর এবং গূঢ় রহস্যপূর্ণ, যা বর্ণনা করার বিষয় নয়, সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করার মতও নয়। তাই এই সম্পর্কে যত্র তত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার অনুমতিও নাই। সাধারণভাবে বুঝবার জন্য শুধু এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, রুহের জগত এবং আলমে-মালাকুত একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত, কেননা উভয়টিই রাববানী রহস্যজগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তা'লা দুই জায়গায় এই ব্যাপারে দুইটি ইশারা প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম বলিয়াছেন—"বলিয়া দাও, রুহ আমার রবের নির্দ্দেশ মাত্র।"

দ্বিতীয় এক স্থানে বলিয়াছেন'—সৃষ্টি এবং তার নির্দ্দেশনা একমাত্র আল্লাহর হাতে সীমাবদ্ধ।''

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রুহের জগত এবং সৃষ্টি ও তার পরিচালনার জগত এক অভিন্ন এবং পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তবে বিষয়টি এতই সূক্ষ্ম যে, এই সম্পর্কে বর্ণনা করার ভাষা কোন কালেই কোন গবেষকের সাধ্যায়ত্ব ছিল না, এখনও নাই। বস্তুতঃ বিষয়টি আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া উপলব্ধিই শুধু করা যাইতে পারে, গবেষনার মাধ্যমে এই রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমি শুধু এতটুকু দেখাইতে চাহিয়াছি যে, কঠিন রোগ এবং বিপদমুক্তির সহিত সদকা-খয়রাতের সম্পর্ক কত গভীর। এই প্রসঙ্গেই তো বলা হইয়াছে যে,—"দোয়া বালা-মুছিবত ফিরাইয়া দেয়।" অন্য এক হাদীছে আসিয়াছে,—"দোয়া এবং বালা-মুছিবত পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।"

দোয়ার মাধ্যমে আত্মার আকুতি নিবেদন যদি জামাতের ছুরতে হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সাফাল্যমণ্ডিত হয়। এস্তেসকার নামায এবং জামাতের সহিত নামায পড়ার মূল তাৎপর্য্য ইহাই। এই দুই অবস্থাতেই সম্মিলিত ভাবে আকুতি নিবেদন করা হইয়া থাকে।

আমার উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানী এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুসারে গরম প্রভাবে সৃষ্ট অসুখ-

বিসুখ ঠাণ্ডার মাধ্যমে দূর করা হয়। যে সব কারণে অসুস্থতা সৃষ্টি হয় সেইসব কারণ দূর করিয়া দেওয়া অথবা শরীরে যেসব উপাদানের অভাব দেখা দিলে অসুখ হয়, সেইগুলি পরোক্ষভাবে পূরন করিয়া দিলেই তো কেবল অসুস্থতা দূর হওয়া স্বাভাবিক। দোয়ার বা সদকার এখানে কি ভূমিকা থাকিতে পারে?

এই ধরণের প্রশ্নের মধ্যে যেমন স্থূল যুক্তি আছে, তেমনি কিছুটা সত্য যে নাই তা নয়। কেননা, সুস্থতা এবং অসুস্থতা আমরা স্থূল ভাবেই অনুভব করিয়া থাকি। কিন্ত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানী যদি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তিনি অবশ্যই অনুভব করিতে পারিতেন যে, শরীরের কলকব্জায় বৈকল্য সৃষ্টি হওয়া এবং দ্রব্যগুণের মাধ্যমে সুস্থ হইয়া উঠার বিষয়টিও স্থূল দৃষ্টিতেই বৈসাদৃশ্য পূর্ণ। কেননা, বস্তুর মধ্যে প্রভাব এবং শরীরের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রন করিতেছেন, তাঁহার কুদরতের রাজ্য সম্পর্কে ধারনা না থাকিলে এই ধাঁধার কোন কিনারা করা সম্ভবই নয়।

একটি মিছালের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝানো যাইতে পারে। যেমন, একটি পিপিলিকা কাগজের একপ্রান্তে বসিয়া দেখিতেছে যে, সাদা কাগজের উপর একটি কলম একদিক হইতে কালো দাগ কাটিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া পিপিলিকার যদি ধারণা হয় যে, কলমই সাদা কাগজের উপর কালো দাগ কাটিয়া যাইতেছে, তবে পিপিলিকার সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। কেননা, পিপিলিকার দৃষ্টি লেখকের হাত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি কলমের অগ্রভাগটুকুকেই শুধুমাত্র কর্মরত দেখিতে পায়।

কোনক্রমে যদি লেখকের হাতটুকু পর্যন্ত পিপিলিকার দৃষ্টি আসিয়া পতিতও হয়, তবুও কি লেখা সম্পর্কে পিপিলিকার পক্ষে সঠিক ধারনায় উপনীত হওয়া সম্ভব? কেননা, লেখা কি কলমের পিছনে নড়াচড়ারত হাতের কয়েকটি আঙ্গুলের কাজ? লেখাপড়া সম্পর্কে যাঁহাদের ধারণা আছে, তাহারা অবশ্যই উপলব্ধি করিবেন যে, লেখকের অন্তর মধ্যে লুকায়িত আবেগ, ইচ্ছাশক্তির প্রস্রবণ-বাহিত হইয়া হাতকে পরিচালিত করে এবং সেই

পরিচালিত হাত কলমকে পরিচালনা করিয়া কাগজের বুকে কথার মালা গাঁথিয়া যাইতে থাকে। অন্তরের গভীরে স্পষ্ট ভাব দ্বারা পরিচালিত না হইলে শুধু হাত এবং কলমের দ্বারা হিজিবিজি অঙ্কন সম্ভব হইতে পারে, অর্থপূর্ণ কোন লেখার জন্ম সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাহ্যত কলমের নড়াচড়া এবং তার পশ্চাতে কার্যরত হাতের পরিচালিকাশক্তি হইতেছে প্রকৃত পক্ষে লেখকের অন্তর বা দেখার ক্ষমতা স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন পিপিলিকাতো দূরের কথা, বিদ্যাহীন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়।

এই মিছালের মধ্যে কলমকে চিকিৎসক, লেখাকে তাঁর প্রদত্ত ঔষধ এবং হাতকে কলমের পরিচালিকা শক্তি আলমে মালাকুত এবং লেখকের অন্তরকে সব কিছুর আসল পরিচালক সবকিছুর প্রকৃত নিয়ন্ত্রক রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে,—মুমেনের অন্তর পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দুই আঙ্গুলের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।" (১)

মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁহার সৃষ্টিরহস্যের সকল রহস্যরাজীর বাস্তব নমুনা হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি তার আত্মপরিচয় লাভ করিতে পারে সেই কেবল তার রবের পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হয়।"(২)

কুদরতে রব্বানীর যে স্তর-বিন্যাস রহিয়াছে, তন্মধ্যে কলম, হাত এবং তার উপর অন্তরের চালিকাশক্তির যে পর্যায়ক্রমিক ভূমিকা তন্মধ্যে প্রথম দুইটি স্থূল, তাই নিম্নস্তরের এবং শেষের বিষয়টি উপলব্ধিগত, তাই উচ্চস্তরের। সুতরাং যাঁরা প্রশ্ন উথাপন করেন তাহাদিগকে দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ এবং উন্নত করিয়া স্থূলতার পিছনে যে সূক্ষ্ম রুহানিয়াত লুকায়িত আছে, তা উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা অর্জন করা কর্তব্য। বলা বাহুল্য, বস্তুগত জ্ঞান নিয়াই যাহারা তুষ্ট, তাহাদের পক্ষে এই উপলব্ধির জগতে পৌঁছা সম্ভব নয়। চিন্তাধারার এই আকাশ-পাতাল পার্থক্যটুকু বুঝাইবার জন্যই আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন,—"মানুষকে আমি অতি উত্তম উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি,

---

(১) انما قلوب المؤمنين بين اصبعين من اصابع الرحمن ـ

(২) من عرف نفسه فقد عرف ربه ـ

আবার তাহাকে সর্ব নিম্ন স্তরেও নামাইয়া দিয়াছি।'' (১) এই আয়াতের মর্মার্থ হইতেছে, রুহানিয়াতের সর্বোত্তম স্তর এবং স্থুলতার সর্বনিম্ন স্তরের যে বিস্ময়কর সমন্বয় মানুষের মধ্যে ঘটানো হইয়াছে তৎপ্রতি ইশারা করা।

মানুষের দৃষ্টি যেহেতু শরীর-বিজ্ঞান এবং স্থুল বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ সেইজন্য শারিরীক রোগ-ব্যাধি এবং আপদ-বিপদে পতিত হইয়া রুহানী সাহায্য লাভ করার প্রতি তাহারা আকৃষ্ট হয়না। রুহানীয়াতের জগত পর্য্যন্ত পৌছার জন্য অর্থ সম্পদ বা পদমর্য্যাদা কোনই কাজে আসে না। দোয়া এবং হৃদয় অনুভূতির ভাষায় ভর করিয়াই শুধু সেই পর্য্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব।—"একমাত্র পাক-পবিত্র বাণীই তাঁহার সকাশে আরোহণ করিয়া থাকে।'' (২) সুতরাং দোয়াকে উর্দ্ধজগতে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত এখলাছ-পূর্ণ আমলের প্রয়োজন! "একমাত্র আমলে ছালেহের দ্বারা উহা উর্দ্ধজগতে আরোহণ করার শক্তি লাভ করে।'' (৩)

সদকা-খয়রাতের বেলায়ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রহিয়াছে। বেনামাজী পেশাদার ফকীর-মিছকীনদিগকে বাড়ীর দরজায় সমবেত করিয়া উহাদের মধ্যে গোশত রুটি কিংবা টাকা-পয়সা বণ্টন করিয়া কখনও রুহানীয়তের জগত পর্য্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। কেননা, এই ধরনের দানের মাধ্যমে অভাবী পেশাদার লোকদের পাওয়ার আকাংখাকেই শুধু উসকাইয়া দেওয়া হয়। আর এই সমস্ত না-শুকুর লোকের অন্তর কোন অবস্থাতেই পরিতৃপ্ত হয় না। অপরদিকে দ্বীনদার এবং দ্বীনের কাজে সদা সর্বদা নিয়োজিত লোকেরা সর্বাবস্থায় আলমে মালাকুত তথা রুহানীয়তের দুনিয়াতেই আত্মাকে নিবদ্ধ রাখেন। ইহাদের আন্তরিক সন্তুষ্টি রুহানী দুনিয়া পর্য্যন্ত পৌছার সহজতম পন্থা। কারণ, লোভ-লালসা অথবা শয়তানের কব্জা হইতে ইহাদের অন্তর পাক-ছাফ হইয়া থাকে।

---

(১) لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم - ثم رددناه اسفل سافلين -

(২) اليه يصعد الكلم الطيب -

(৩) العمل الصالح يرفعه -

বর্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আপনি পাঁচ জন সৎ এবং দক্ষ লোককে নিয়োজিত করুন। ইহারা প্রকৃত দ্বীনদার দরিদ্র দরবেশ এবং যে সমস্ত লোক দ্বীনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকার কারণে ঘর সংসারের দিকে তেমন নজর দিতে পারে না, ঐ সমস্ত লোককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোপনে যেন তাঁহাদের নিকট খয়রাতের অর্থ পৌছাইয়া দেন। এমন লোকদের আন্তরিক দোয়ার বরকতেই দুরারোগ্য ব্যধির প্রকৃত সুচিকিৎসার পথ খুলিয়া যাইবে। কোন দক্ষ চিকিৎসকের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া এবং সেই চিকিৎসকের অন্তরে এই রোগের যথার্থ ঔষধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হওয়া একমাত্র এই পথেই সম্ভব।

সাবধান! কোন মুর্খ চিকিৎসকের কথায় কান দিবেন না। কোন কুসংস্কার-গ্রস্ত লোকের কথায়ও পড়িবেন না। অভিজ্ঞ দক্ষ চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হইয়া সুচিকিৎসার নিমিত্ত আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। এতে রোগীর অন্তরে আস্থারও সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকের প্রতি রোগীর আস্থাও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। আল্লাহ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষন করুণ।

চতুর্থ পত্র

দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তাগণের প্রতি লিখিত

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তা'লা বলেন,—"যে ব্যক্তি একটি অনুপরিমাণ সৎকাজ করিবে, তা সে দেখিতে পাইবে এবং যে একটি অনুপরিমাণ অসৎ কাজ করিবে, সে তাও দেখিতে পাইবে ''(১)

মানুষের কর্ম, কথাবার্তা অথবা মৌনতা, তার দান খয়রাত বা কার্পন্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি আমল হয় সৌভাগ্যের ভাণ্ডার হিসাবে সঞ্চিত হইতেছে অথবা দুর্ভাগ্যের এক একটি ভয়াবহ খাদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। মানুষ তার কাজকর্ম

---

(১) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره -

সম্পর্কে গাফেল বে-খেয়াল থাকে কিন্তু আল্লাহর তরফ হইতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তার ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি আমল, এমনকি প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। আল্লাহ তা'লা যেখানে মানুষের প্রত্যেকটি মুহূর্ত গননা করিয়া যাইতেছেন, সেখানে সে তার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অনবরত ভুলিয়া যাইতেছে। যে মুহূর্তে মানুষ এই দুনিয়া হইতে বাহির হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্তে তার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কর্ম পৃথক দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার সম্মুখে পেশ করা হইবে। কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে—"সেইদিন প্রত্যেকটি মানুষ যা কিছু সৎকর্ম করিয়াছে দৃষ্টির সম্মুখে দেখিতে পাইবে। আবার অন্যায় অনাচার যা কিছু করিয়াছে, তাও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। সে তখন আক্ষেপ করিয়া এইরূপ আকাংখা করিবে, হায়! এই সমস্ত দুষ্কর্ম হইতে যদি সে দীর্ঘকালের ব্যবধানে থাকিতে পারিত!"

অতঃপর সৎকর্মরাশী এক পাল্লায় এবং দুস্কর্মগুলি অন্য পাল্লায় রাখিয়া ওজন করা হইবে। কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে হিসাব-কিতাবের সেই অভাবিতপুর্ব দৃশ্য দেখিয়া মানুষের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ভীতিবিহ্বল অন্তর নিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিবে, তার পাল্লা কোন দিকে কাত হয়, সেই দৃশ্য দেখার জন্য।

—"যাহাদের সৎকাজের পাল্লা ভারি হইবে, তাহারা অত্যন্ত সুখী সন্তুষ্ট জীবন যাত্রা লাভ করিবে। আর যাহাদের সৎকর্মের পাল্লা হালকা হইবে, তাহাদের আশ্রয় হইবে হাবিয়া। তোমরা জান কি উহা কি বস্তু,—জলন্ত অগ্নিকুন্ড।"

ধনবানদের অবস্থাও হইবে অনুরূপ। নফছের খাহেশাত বা প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে তারা যা কিছু খরচ করিতেছে, তাহা অন্যায়ের পাল্লায় যাইবে। আর যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের পথে খরচ হইবে সেই সমুদয় নেকীর পাল্লায় যাইবে। যদি কোন ধনবান ব্যক্তি তার অর্জ্জিত মোট সম্পদের অর্দ্ধেকের বেশী আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে খরচ করিয়া যাইতে পারে, তবেই কেবলমাত্র ধনের ব্যাপারে সে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যদি ভোগ-বিলাস এবং সঞ্চয়ের খাতায় মোট অর্জ্জিত সম্পদের অর্দ্ধেকের বেশী খরচ হয়, তবে তার পক্ষে নাজাতের আশা করা যায় না।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রঃ) ধন-সম্পদের বালা হইতে মুক্তিলাভ করার উদ্দেশ্যে সমুদয় সম্পদই হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের খেদমতে আনিয়া হাজির করিয়াছিলেন। তিনি পরিবার-পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া জবাব দিয়াছিলেন যে,—"আল্লাহ এবং তাঁর রাছুলকে রাখিয়া আসিয়াছি।

মালদারদের সম্পর্কে রাছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন যে,—"ধনবান মাত্রই ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইবে তবে যাহারা ডানে-বামে সমানে খরচ করিয়া থাকে, শুধু তাহাদের পক্ষেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব হইবে।" হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রঃ) এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মওকামত সংকটের কবল হইতে মুক্তি লাভের আসায় অর্জ্জিত সমস্ত সম্পদই আল্লাহর পথে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই মালের প্রতি আসক্তি এবং কার্পণ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। ধন-সম্পদ ব্যয়ের মধ্যে যে সীমাহীন পূন্য তা অর্জ্জন করার পথে প্রকৃতিগত বাধা-বন্ধনের সীমা নাই। তাই এই ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প এবং অন্তর মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

মাল ব্যয় করার সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রকৃত হকদারদের মতো তা খরচ করিতে পারিলে বহুগুণ বেশী পূন্য লাভ করা যায়।

হালাল রোজগারের মাল হইতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত আলেমগণের সহায়তা করিতে পারিলে হাজারগুণ বেশী ফল পাওয়ার আশা আছে। তবে দান করিয়া যেন তাঁহাদের উপর কোন চাপ প্রয়োগ অথবা অনুগত করার গোপন আকাংখা অন্তরে না থাকে। আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন,—"তোমরা খুঁটা দিয়া কিংবা দান গ্রহীতাকে অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দিয়া তোমাদের খয়রাতসমূহ বরবাদ করিও না।

---

(১) لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى -

পঞ্চম পত্র

মাগরেবে-আকসার কাজীগণের প্রতি ঃ

(ইমাম গাযযালী বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাছার প্রধান হিসাবে কার্যরত থাকা অবস্থায় মাগরেবে আকসা (বর্তমান মরক্কো, তিউনিসিয়া প্রভৃতি এলাকা) হইতে মারওয়ান নামক একব্যক্তি তাহার পিতার তরফ হইতে কাজীপদে নিয়োগলাভ করার দরখাস্ত সহ বাগদাদে হাজির হন। মারওয়ানের পিতা ইমাম গাযযালীর পরিচিত এবং কাজীপদের জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তাই ইমাম সাহেব খলিফা মোস্তাযহার বিল্লাহর বরাবরে উক্ত ব্যক্তির স্বপক্ষে একটি সুপারিশনামা লিখিয়া দিলেন। খলিফা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে কাজীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদানে রাজী হইলেন না. তবে ইমাম সাহেবের সুপারিশের মর্য্যাদা রক্ষার্থ পত্রবাহক মারওয়ানকেই কাজী হিসাবে নিয়োগপত্র দিয়া দিলেন।

মারওয়ান এই পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এই নিয়োগপত্র তাঁহার জন্য অস্বস্থির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, তিনি আসিয়া ছিলেন পিতার তরফ হইতে আবেদন পেশ করার জন্য। এমতাবস্থার পরিস্থিতির আগাগোড়া ব্যাখ্যা করিয়া পিতার নিকট ব্যক্তিগত একটি পত্র লিখিয়া দেওয়ার জন্য তিনি ইমাম সাহেবকে অনুরোধ জানাইলেন।

ইমাম সাহেব কাজী মারওয়ানের অনুরোধে মাগরেবে আকসার কাজীগণকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেণ। পত্রে পরোক্ষভাবে মারওয়ানের নিয়োগ সংক্রান্ত পরিস্থিতিও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়)

بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - والعاقبة للمتقين - ولا عدوان الا على الظالمين - والصلوة والسلام على سيد المرسلين واله اجمعين -

কাজী মারওয়ানের মাধ্যমে আপনার ন্যায় একজন বিশিষ্ট আমীর এবং উচ্চ পদস্থ সরকারী দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

এই বন্ধন আত্মীয়তার বন্ধনের চাইতে কম বলিয়া আমি মনে করিনা। এই সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ হইতে অন্ততঃ পত্র যোগাযোগ কায়েম থাকা বাঞ্ছনীয়।

বন্ধুত্বের এই সম্পর্ককে একটি উচ্চস্তরের উপদেশবাণীর মাধ্যমে আরও একটু গভীরতর করার উদ্দেশ্যেই এই পত্র লেখা হইতেছে। উলামগণের তরফ হইতে ইহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তোহফা। প্রকৃতপক্ষেও এই তোহফা অত্যন্ত মূল্যবান। এই তোহ্ফা সশ্রদ্ধ অন্তরে কবুল করা এবং দুনিয়াদারীর অন্ধকার হইতে অন্তর মুক্ত করিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা জরুরী।

আমি আপনাকে বিশেষ ভাবে এই মর্মে তাকিদ করিতেছি যে, মানুষ যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেখানে আপনি সর্বাবস্থায় জ্ঞানী এবং পরহেজগারগণের দলে থাকিবেন। রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং মর্য্যাদাবান কাহারা? জবাব দিয়াছিলেন, যাহারা সবচাইতে বেশী পরহেজগার।

জিজ্ঞাসা করা হইল,—'সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কাহারা?

জবাব দিলেন,—"যারা মৃত্যুকে সবচাইতে বেশী স্মরণ করিয়া থাকে। সর্বোপরি পরহেজগারী এবং জীবনের রহস্য সম্পর্কে যে ব্যক্তি সর্থাপেক্ষা বেশী অনুভূতি রাখে।"

অন্য এক হাদীছে রাছুল মকবুল (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন,—সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নাফছকে আয়ত্বে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরদিকে সর্বাপেক্ষা মুর্খ না-দান সেই ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত জীবন-যাবন করিতেছে।"

মানবকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন জাহেল ঐ সমস্ত লোক যারা সদা সর্বদা শুধুমাত্র দুনিয়া কামাই করার কাজে নিয়োজিত থাকে। মৃত্যুর সময় যে সব বিষয় নেহায়েত তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবে ঐ সমস্ত বিষয়কে যে জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান কাজ বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। এই সমস্ত লোক কখনও চিন্তা করার সুযোগ পায় না যে, তারা কি জান্নাতীদের দলভুক্ত হইবে, না জাহান্নামীদের! অথচ আল্লাহ তা'লা পরিণতির সেই তথ্য সম্পর্কে

মানুষকে সুস্পষ্টভাবেই পরিচিত করাইয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন, নেককারেরা জান্নাতের অধিবাসী হইবে এবং পাপী বদকারেরা জাহান্নামের অধিবাসী।" (১)

অন্য এক জায়গায় এরশাদ করা হইয়াছে,—"এবং যে ব্যক্তি অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিয়াছে, নিশ্চিতরূপে জাহান্নামই হইবে তাহার আশ্রয়স্থল।

আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের মাকাম সম্পর্কে ভয় করিয়াছে, এবং প্রবৃত্তিকে যথেচ্ছাচার হইতে বিরত রাখিয়াছে, জান্নাতই হইবে তাহাদের আশ্রয়।" (২)

অন্যত্র বলা হইয়াছে,—"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন এবং এই জীবনের সাজ-সজ্জারই আকাংখী হইবে, তার সকল আমলের বদলা আমি এই জীবনেই চুকাইয়া দিব। তাহাদিগকে এখানে ঠকানো হইবে না। ইহারা ঐ সমস্ত লোক, আখেরাতের অগ্নিব্যতীত যাহাদের জন্য আর কিছু নাই। দুনিয়াতে তাহারা যা কিছু করিয়াছে সবই মিছমার হইয়া যাইবে এবং মুছিয়া যাইবে তাহাদের সকল আমল।" (৩)

আমি চাই, উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন। এই সমস্ত সতর্কবাণীর আলোকে স্বীয় নাফছ এর গতিবিধি লক্ষ্য করুন।

---

(১) ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم -

(২) فاما من طغی واثر الحیوة الدنیا فان الجحیم هی الماوی ○ واما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان الجنة هی الماوی ○

(৩) من کان یرید الحیوة الدنیا وزینتها نوف الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لایبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها باطل ما کانوا یعملون ○

অবশ্য এর আগে নিজের জাহের ও বাতেন, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি প্রদান করুন। আপনার সকল কাজকর্ম, কথাবার্তা, উঠা-বসা সবকিছুর একটি হিসাব গ্রহণ করুন। এইগুলির গতি-বিধিকি আল্লাহর নৈকট্য এবং সৌভাগ্যের পথে আপনাকে পরিচালিত করিতেছে না আপনার গতিকে দুনিয়ার জীবন আবাদ করার পথে ঠেলিয়া দিতেছে! এমন কি দুনিয়ার নেশায় আপনাকে মত্ত করিতেছে, যা অর্জন করার পথে একের পর এক কঠিন পরীক্ষা, বালা-মুছিবত এবং হিংসা-বিদ্বেষের ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত অন্তর কঠিন হইতে কঠিনতর গোনাহে লিপ্ত ও চির দুর্ভাগ্যের কাঠিন্যে জড়াইয়া যাওয়াই সার হয়।

সুতরাং সময় থাকিতে অন্তরদৃষ্টি উন্মিলিত করার চেষ্টা করুন, এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। বুঝিতে চেষ্টা করুন, নাফছ আপনাকে ভবিষ্যতের কোন পরিণতির দিকে লইয়া যাইতেছে?

স্মরণ রাখিবেন, নাফছই হইতেছে আপনার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সহচর। নাফছ এর গতিবিধিই আপনাকে আপনার অন্তর্নিহিত আকাংখার স্বরূপ সম্পর্কে পথ দেখাইবে।

উপরোক্ত উপলব্ধির আলোকে এখন শান্ত মনে ভাবিয়া দেখুন, আপনি কোন বস্তুর আকাংখা করিবেন। নাফছ আপনাকে কিসের আকাংখায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে? যদি আপনি কোন বিস্তৃত এলাকার জায়গীরদার হওয়ার ফিকিরে থাকিয়া থাকেন তবে কান পাতিয়া শুনুন, আল্লাহ আপনাকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—"কত সুন্দর জনপদ ছিল, যেগুলিকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি! "আজ সেই সমস্ত সমৃদ্ধ জনপদের কোন চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অথচ এই সমস্ত সব জনপদে তার অধিবাসীগণ পরম সুখে দিনাতিপাত করিত।

যদি আপনি কুপ খনন কিংবা নহর তৈরী করার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে চিন্তা করিয়া দেখেন না কেন কত গভীর কুপ শুকনা অবস্থায় এখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে, কত খাল-নহর মাটির বুকে শেষচিহ্নটুকুও টিকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

যদি দালান-কোঠা তৈরী করা আপনার জীবনের লক্ষ্য হইয়া থাকে, তবে

ভাবিয়া দেখিবেন, কত সুন্দর সুন্দর ইমারত, বিশাল সুসজ্জিত প্রাসাদরাজী স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ধ্বংস্তুপে পরিণত হইয়া অনাগত বংশধরদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কালের করালগ্রাস হইতে সেইঁ সমস্ত সুদৃশ্য প্রাসাদরাজীকে কেহ রক্ষা করিতে পারে নাই।

যদি আপনি কোন বাগান বা শষ্যক্ষেত্রের মালিক হওয়ার আকাংখা করিয়া থাকেন, তবে শুনুন! আল্লাহপাক আপনাকে ডাকিয়া কি বলিতেছেন?—"কত বাগান, ঝরনা, শষ্য ক্ষেত্র, উত্তম বাড়ী-ঘর এবং ভোগ-বিলাসের উপকরনই না ছিল যা তাহারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত, সব কিছুই তাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এমনি ভাবেই আমি এই সমস্ত অন্য সম্প্রদায়ের হাতে তুলিয়া দেই। উহাদের জন্য আকাশ কিংবা পৃথিবী ক্রন্দন করে নাই, তাহাদিগকে সামান্য অবকাশও দেওয়া হয় নাই।" (১)

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'লার এই বাণী পাঠ করুন,—"তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কয়েক বৎসরের জন্য আমি তাহাদিগকে ভোগ করার সুযোগ প্রদান করি, তবুও তো তাহাদের উপর অঙ্গীকারকৃত সেই পরিণতি অবশ্য আসিয়া উপনীত হয়, আমার দেওয়া ভোগসামগ্রী তাহাদিগকে সেই পরিণতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"(২)

যদি আপনি কোন রাজা-বাদশার সহচর আমির-ওমরায় পরিণত হইয়া বড় মানুষ হিসাবে পরিগণিত হইতে চান তবে একবার আপনাকে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সেই হাদীছখানার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে

---

(১) كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين - وكذلك اورثناها قوما اخرين - فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ০

(১) افرءيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ০

বলিব যেখানে বলা হইয়াছে,—"আমীর-ওমরা এবং পদস্থ লোকগণকে হাশরের ময়দানে পিপিলিকার আকৃতিতে উঠানো হইবে, সেখানে তাহারা মানুষের পদতলে নিস্পেষিত হইতে থাকিবে"। এই হাদীছ দ্বারাও যদি আপনার আকাংখা তৃপ্ত না হয়, তবে আরও একটু শ্রবণ করুণ। আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক অহঙ্কারী ব্যক্তির মাথার উপর একজন কঠোর প্রকৃতির নেগাহবান মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার হাতে এই অহঙ্কারের পরিসমাপ্তি বিধিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—

ঃ এমন উচ্চাকাংখী অহমিকাপ্রিয় লোকদের পরিণতি কি হইয়াছে, ইহাদের জীবৎকালেই উহারা অপরাপরের সম্মুখে আক্ষেপের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।" অর্থাৎ অন্যায় উচ্চাকাংখার শিকারে পরিণত হইয়া এমন দুঃখজনক পরিনতির দিকে তাহারা আগাইয়া গিয়াছে, যাহা দেখিয়া অন্যদের অন্তরেও করুণার সৃষ্টি হইয়াছে। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেন—

ঃ একটি নিরীহ মেষপালের মধ্যে দুই-দুইটি বাঘও যে ক্ষতি সাধন করিতে পারে না, ধন-দওলত এবং পদমর্য্যাদার উচ্চাকাংখা মুমেন ব্যক্তির ঈমানের ক্ষেত্রে সেই ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে।"

আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে আমার অনুসারীগণ! ধন-সম্পদ দুনিয়ার জীবনে আরাম আয়াশের সামগ্রী বটে, তবে আখেরাতের জীবনে উহা প্রভূতক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। আমি আল্লহার শপথ করিয়া বলিতে পারি, ধনীরা উর্দ্ধজগতের বাদশাহীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।"

নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—ধনবান লোকদিগকে হাশরের ময়দানে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উঠানো হইবে। তন্মধ্যে একভাগ হইবে ঐ সমস্ত লোকের যাহারা হালাল পথে ধন-দওলত অর্জ্জন করিয়া হালাল পথেই তাহা খরচ করিয়া গিয়াছে। আল্লাহ তা'লা ফেরেশতা-গণকে নির্দ্দেশ দিবেন,—ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা আমার নির্দ্দেশিত পথের বাহিরে কোনদিন খরচ করিয়াছে কিনা, ধন-সম্পদের নেশায় মত্ত

হইয়া কোনদিন নামাজে, অজুতে, রুকু-ছেজ্দায়, এবাদতে যথার্থ মনোযোগ প্রদানে কোন প্রকার ত্রুটি করিয়াছে কি না? যাকাত অথবা হজ্জ আদায় করিতে গিয়া কোন ত্রুটি হইয়াছে কিনা? তাহারা জবাব দিবে, আমরা হালাল পথে সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছি এবং শরিয়তের সীমারেখার ব্যাপারে আমাদের দ্বারা কোনই ত্রুটি হয় নাই।

পুনরায় বলা হইবে, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর,—আত্মীয়-স্বজন আশ-পড়শী এবং যথার্থ হকদারগণের অধিকার সম্পর্কে ইহারা পূর্ণ মাত্রায় সজাগ ছিল কিনা, এবং তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে যাইয়া ইহাদের দ্বারা কোন কমবেশী হইয়াছে কিনা? হকদারদিগকেও এই সময় তাহাদের চারিদিকে সমবেত করা হইবে। উহারা তখন যদি এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে যে,—আয় পরওয়ারদেগার! এই সমস্ত লোক আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান ছিল। আমাদিগকে আপনি ইহাদের মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা আমাদের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করিত না। প্রচুর থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে পরিতৃপ্তি সহকারে দান করিত না। তা হইলে তৎক্ষনাৎ এই সমস্ত লোককে জাহান্নামের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। অথবা বলা হইবে,—এইখানে দাঁড়াও, যা তোমাদিগকে দান করা হইয়াছিল তার প্রতিটি বিন্দুর শোকর-গোযারী করার আগে এখান হইতে এক পাও তোমরা নড়িতে পারিবেনা।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যারা হালাল পথে সম্পদ অর্জ্জন করিয়া আল্লাহর সর্বপ্রকার হক আদায় করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেই যদি এমন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে অবশিষ্ট তিনদল অর্থাৎ যাহারা দিনরাত্রি প্রবৃত্তির আনুগত্য করিয়া ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিয়া হারাম কামাই করিয়া অথবা দিনরাত্রি শুধুমাত্র মাল-দওলতের পশ্চাতে ঘুরিয়াই জীবনপাত করিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় হয়, তাহাদের পরিণাম কি হইবে! এই ধরনের লোক সম্পর্কেই তো আল্লাহ পাক বলিয়াছেন,—"সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা জনিত অহঙ্কারে তোমাদিগকে মৃত্যুর মুখামুখি হওয়া পর্য্যন্ত গাফেল করিয়া

রাখিয়াছে। সাবধান হও! খুব শীঘ্রই এর পরিনতি সম্পর্কে তোমরা অবহিত হইবে।"(১)

জীবনের পরিণতি সম্পর্কিত এই মহাসত্য সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়ার পরও অলীক আকাংখা এবং অতৃপ্ত কামনা-বাসনার বেড়াজাল ঐ সমস্ত লোকই শুধু সৃষ্টি করিতে পারে, যাহাদের অন্তরজগৎ শয়তান কর্তৃক পরিপূর্ণ রূপে অধিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাহাদের শুভবুদ্ধি শয়তানের চক্রান্তে পরিপূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত লোক কিন্তু শয়তানের দৃষ্টিতেও নিতান্ত হাস্যাস্পদ এবং নিছক খেল-তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়!

অন্তর মধ্যে যে সমস্ত রোগ শিকড় গাড়িয়া বসে, সেই সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা ঐরূপ প্রত্যেকেরই মৌলিক দায়িত্ব, যাহারা প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে বদ্ধপরিকর। স্মরণ রাখা দরকার যে, শারিরীক রোগ-ব্যধির চিকিৎসার চাইতে আত্মার রোগের চিকিৎসা করা অনেকগুণ বেশী জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই রোগের কবল হইতে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত লোকই মুক্তিলাভ করিতে পারে, যাহাদিগকে আল্লাহ পাক শুদ্ধ অন্তর এবং নির্ভুল প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন।

আত্মার রোগের জন্য সহজ দুইটি ঔষধের একটি হইতেছে সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং মৃত্যু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। এদতসঙ্গে রাজা-বাদশাহ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের পরিণতি হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিভাবেই না তাহারা সম্পদের পাহাড় সঞ্চয় করিয়াছিল, কত শান শওকতের প্রাসাদরাজীই না তারা তৈরী করিয়াছিল। অহঙ্কার আত্মম্ভরিতায় তাহাদের পা মাটিতে পড়িত না, ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া তাহারা জীবন-যাপন করিত। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তাহাদের সেই সমস্ত হর্ম্যরাজীতে কবরের নিরবতা নামিয়া আসিয়াছে। কালের প্রবাহে একে একে ধবসিয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ তা'লা কি চমৎকার ভাবেই না আমাদিগকে চিন্তা করার আহ্বান জানাইতেছেন,—"ইহারা কি

---

(১) ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ০

ঐ সব ঘটনা হইতেও পথ নির্দেশ পায় না যে, তাহাদের আগে কত সমৃদ্ধ জনপদের অধিবাসীগণকেই তো আমি ধ্বংশ করিয়া দিয়াছি। উহাদের সেই সব গর্বোদ্ধত প্রাসাদরাজীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাহারা চলাফেরা করে, এই সবের মধ্যে নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। এর পরও কি ইহারা মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ করিবে না ?''

এই সমস্ত লোকের সমৃদ্ধ বাড়ী-ঘর, সুবিস্তৃত রাজ্যসীমা, পরবর্তী বংশধরগণকে যেন ডাকিয়া বলিতেছে যে, এখনও চিন্তা কর, ইতিহাসের গতিধারা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। একদা যাহাদের নামে চরাচর প্রকম্পিত হইত আজ তাহারা কোথায় হারাইয়া গেল! তাহাদের কোন খবর কি আজ তোমরা কেহ সংগ্রহ করিতে পার ? তাহাদের কোন চিহ্ন কি তোমরা কোনমতে সংগ্রহ করিতে পার ?

আত্মার রোগের দ্বিতীয় চিকিৎসা হইতেছে আল্লাহর কিতাব নিয়া সর্বদা চিন্তা গবেষনা করিতে থাকা। কেননা, দুনিয়ার মানুষের জন্য কুরআনই একমাত্র সঠিক চিকিৎসা এবং রহমতের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম সর্বদা দুইটি উপদেষ্টাকে চোখের সম্মুখে রাখার জন্য উম্মতের প্রতি অন্তিম উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেষ্টাদ্বয় কখনও বাঙময় হইয়া কখনও বা নির্বাক থাকিয়া আমাদিগকে উপদেশ দান করিয়া চলিয়াছে। এর একটি হইতেছে আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হইতেছে রাছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছল্লামের সুন্নাহ।

আজকাল লোকজনকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে জীবন্ত মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কুরআন ছাড়িয়া দিয়া উহারা মৃতে পরিনত হইয়া গিয়াছে। অনেকে মুখে কুরআন পাঠ করিয়া থাকে বটে কিন্তু কুরআনের পয়গাম সম্পর্কে উহারা বোবা। কানে কুরআনের বাণী শ্রবন করিলেও উহাদের অন্তরের কান বধির হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়া কুরআনকে দেখিতে পাইলেও উহার মর্মদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিশক্তি পৌঁছিতে পারিতেছে না। অনেকে কুরআনের তফছীর পর্য্যন্ত বয়ান করিয়া থাকে. কিন্তু নিজেরাই কুরআনের মর্মবাণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জাহেল রহিয়া গিয়াছে। আপনাকে সাবাধন করিতেছি, খবরদার! ঐ শ্রেনীর লোকের অন্তর্ভুক্ত কখনও হইবেন না।

নিজের সকল কাজকর্ম, ভিতর-বাহির সবকিছু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন, আর ঐ সমস্ত লোকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন, যাহারা সময় থাকিতে পরিনামের চিন্তা করে নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শুধু আক্ষেপই তাহাদের জন্য সার হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত লোকের সহিত আপনার নিজের আমলের তুলনা করিয়া দেখুন, যাহারা নিজেদের ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উহাদের আক্ষেপের পরিমাণ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া নিজের কর্মধারা নির্দ্ধারণ করুণ।

কুরআন শরীফের একটি আয়াতের মধ্যে অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রের জন্যই শিক্ষাগ্রহণের প্রকৃষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন,—

ঃ তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ধন সম্পদের মোহ যেন তোমাদিগকে আল্লাহর জিকির হইতে গাফেল করিয়া না রাখে। যাহারা এইরূপ করিবে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'' (১)

খবরদার! খবরদার! সম্পদ সঞ্চয় করার পিছনে লাগিও না। কেননা, সম্পদের নেশায় তোমাদিগকে আখেরাতের কাজ হইতে ভুলাইয়া রাখিবে। তোমাদের অন্তর হইতে ঈমানের স্বাদ দূর করিয়া দিবে। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—''তোমরা দুনিয়াদারদের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিওনা। কেননা, উহাদের সম্পদের জৌলুষ তোমাদের অন্তর হইতে ঈমানের স্বাদ কাড়িয়া নিবে।'' এতো গেল ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরিণতির কথা। এখন চিন্তা করিয়া দেখ ধন সঞ্চয় করিয়া পুঁজিপতি হওয়া, ধন-সম্পদের গরমে অহঙ্কারী এবং অবাধ্য হইয়া পড়ার পরিনাম কি হইবে!

মান্যবর কাজী মারওয়ানের কথায় আসা থাক। আল্লাহ পাক তাঁর এলেম এবং তাকওয়ায় বরকত দান করুণ! তিনি আপনার কৃতি সন্তান, আপনার

---

(১) لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ٥

অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধনের উপকরণ। এলেম এবং তাকওয়ার সম্পদে তিনি সমভাবে সমৃদ্ধ। তবে এই উভয় সম্পদই স্থায়ী হওয়া বাঞ্জনীয়। আর এই স্থায়িত্ব শুধু তখনই হইতে পারে যখন তাঁহার পিতা-মাতা এই ব্যাপারে তাঁহাকে পরিপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তাঁহার আশা-আকাংখা বাস্তবায়িত করার পথে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।

পিতা-মাতার কর্তব্য হইতেছে, জীবন পথে সন্তানের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের আখেরাতের সম্পদ হিসাবে গড়িয়া তোলা। সন্তান যাহাতে আল্লাহর পথে কায়েম থাকিয়া শেষ মনজিল তক পেঁছার ব্যাপারে শান্তমনে কোশেষ করিয়া যাইতে পারে, তার সুযোগ করিয়া দেওয়াও পিতা-মাতার অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব।

আল্লাহর সন্তুষ্টির দরজা পর্য্যন্ত পেঁছার রাস্তা হইতেছে নিজের সামর্থের উপর পরিতৃপ্ত হইয়া হালাল পথে জিবীকা অন্বেষণ করা। দুনিয়াদারদের অতৃপ্ত লালসার পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া নিজেকে দুনিয়া-পূজারী সম্প্রদায়ের অন্যায় উচ্চাকাংখার সহিত জড়িত না করা। এই জিনিষ রাজা-বাদশার এবং আমীর-ওমরাগণের সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়াই অর্জ্জন করা সম্ভব।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে,—"প্রাজ্ঞ আলেমগণ আল্লাহর তরফ হইতে আমানতদার বিশেষ। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা দুনিয়ার লালসায় ডুবিয়া না যান। যখন দেখিবে যে, আলেমগণ দুনিয়া কামাই করার পিছনে লাগিয়া গিয়াছে, তখন তোমরা উহাদের সংশ্রব হইতে দুরে সরিয়া দ্বীনের পথে সুদৃঢ় থাকার চেষ্টা করিও।"

এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাকই আপনাকে পথ নির্দেশ দিয়াছেন এবং আপনার পক্ষে পথ সহজ করিয়াও দিয়াছেন। এখন আপনার কর্তব্য হইতেছে ছেলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া তাহার প্রাণভরা দোয়া গ্রহণ করার পথ খুলিয়া দেওয়া। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে,—পিতা-মাতার জন্য সন্তানের নেক দোয়া আখেরাতের জীবনে অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত হইবে।

আপনার সন্তান যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং সবকিছু তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া এই বয়সে আপনার পক্ষে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাওয়াই

অধিকতর সমিচীন। এলেম এবং তাকওয়ায় বড় হইলে পর সন্তান পিতারও মুরব্বী এবং শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হইয়া যায়। কুরআন শরীফে হযরত ইবরাহীমের যে উক্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়, তার মধ্যেই আমার উপরোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যাইবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—পিতাজী! আমার নিকট এমন এক এলেম আসিয়াছে, যা আপনার নিকট আসে নাই। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন যেন আমি আপনাকে সহজ সরল পথে নিয়া যাইতে পারি।" (১)

যোগ্য সন্তানের প্রতি আপনাদের স্নেহ-দৃষ্টি আরও গভীরতর হওয়া উচিত। কেননা, সে আপনারই কলিজার টুকরা।

স্মরণ রাখিবেন, হাশরের ময়দানে দুনিয়াদারদের সর্বাপেক্ষা বেশী আক্ষেপ হইবে তখন যখন তাহারা দেখিবে যে, যে সমস্ত হীতাকাংখী বন্ধুর প্রতি তাহারা খুব বেশী ভরসা করিত, তাহারাই তখন কোন কাজে আসিতেছে না। কেননা, আল্লাহ তা'লা পরিস্কার বলিয়া দিয়াছেন যে,—"আজকের এইদিনে এখানে কেহ কাহারো বন্ধু নয়।"

আমি দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন আপনার দৃষ্টিতে দুনিয়াকে তুচ্ছ করিয়া দেন, যা সত্যসত্যই তুচ্ছ। আখেরাতকে যেন আপনার দৃষ্টিতে বড় করিয়া দেন, যা প্রকৃত পক্ষেই বড়।

আমাকে এবং আপনাকে যেন তাঁর সন্তুষ্টির পথে আমল করার তওফীক দান করেন। আপনাকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করেন।

---

(১) يا ابت انى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى اهدك صراطا سويا ○

চতুর্থ অধ্যায়

আলেম এবং ইমামগণের প্রতি লিখিত পত্রাবলী

প্রথম পত্র

খাজা ইমাম আব্বাছীকে লিখিত

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!

কোন একজন ছাহাবী হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের খেদমতে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি মাত্র দুইটি কথার মাধ্যমে সমস্ত উপদেশ একত্রিত করিয়া তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ঃ—

ঃ তুমি বল একমাত্র আল্লাহ আমার রব এবং এই কথার উপর দৃঢ় থাক।'' (১)

"রাব্বী আল্লাহ" বা একমাত্র আল্লাই আমার রব, এই কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাতের প্রতি এমন গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর যেন দুনিয়ার যা কিছু সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়, এই সবকিছুই তোমার দৃষ্টির সম্মুখে অর্থহীন এমনকি অস্তিত্বহীন হইয়া যায়। একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের ধ্যানেই যেন তোমার হৃদয়মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

দুনিয়ার রকমারি যা কিছু চোখের সামনে ভাসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলির স্বতন্ত্র কোনই অস্তিত্ব নাই। রাব্বুল আলামীনের যাতের মধ্যেই সবকিছুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। একমাত্র তাহার অস্তিত্বই চির অক্ষয় অবিনশ্বর। অন্যের তরফ হইতে তোমার দৃষ্টি যতই দূরে সরিতে থাকিবে, আল্লাহর অস্তিত্ব ততই তোমার অন্তরে দৃঢ়মূল হইতে থাকিবে। শেষ পর্য্যন্ত এমন এক পর্যায়ে আসিয়া তুমি পৌঁছিতে সমর্থ হইবে যখন একমাত্র সেই একক সত্তা ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। তোমার অন্তর তাঁহাকে ছাড়া আর কোন কিছুর উপর আস্থাও স্থাপন করিতে পারিবে না।

---

(১) قل ربى الله ثم استقم ٥

"দৃঢ় থাকার" দরজা এর পরবর্তী পর্য্যায়ে হাছিল হইয়া থাকে। দৃঢ়তা তিনটি বিষয়ে হইয়া থাকে,—অন্তরে, অন্তর নিঃসৃত গুনাবলী বা অভিব্যক্তির মধ্যে এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এস্তেকামাত বা দৃঢ়তার অর্থ হইতেছে চলা-ফিরা, নড়া-চড়া উঠা-বসা সবকিছুই যেন শরিয়ত নির্দ্ধারিত নিয়মের অধীন হইয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই শুধুমাত্র পরিচালিত হয়।

চরিত্রে এস্তেকামাত এর অর্থ হইতেছে, মনকে এমন সুদৃঢ় করা, যেন মনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই খাহেশাতের কোন অনুভূতিই সৃষ্টি না হয়। মনের যা কিছু প্রেরণা-অনুপ্রেরণা সবকিছুই যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির গণ্ডীর মধ্যে আবর্তিত হয়।

চরিত্রে এস্তেকামতের অর্থ হইতেছে শরিয়তের ইশারা ব্যতীত নাফছের মধ্যে নিজের তরফ হইতে যেন কোন প্রকার অনুভূতির সৃষ্টি না হয়। নাফছের মধ্যে এতটুকু শক্তিও অবশিষ্ট না থাকা চাই, যদ্বারা সে আল্লাহর নির্দ্দেশের বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করিতে পারে। যে কোন খাহেশ বা অনুপ্রেরনাকে সুস্থ বুদ্ধি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিয়া নেওয়ার আগে যেন সেই কাজে অগ্রসর হওয়ার মত উৎসাহই আর অবশিষ্ট না থাকে, মনকে সেইভাবে তৈরী করিতে হইবে। মনকে এমনই একটি নিয়মের অধীন করিয়া নিতে হইবে, যে নিয়মের মধ্যে পড়িয়া সৎকর্ম, সৎকথা এবং শরিয়তের কষ্টিপাথরে যাচাই করা কাজ ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে সে কখনও আকৃষ্টও না হয়।

নফছ বা প্রবৃত্তির সাধারন প্রবনতা হইতেছে, লোভনীয় কোনকিছু সম্মুখে আসিয়া পড়িলে তা হাছিল করার জন্য সে নানাপ্রকার বাহানা তালাশ করিতে শুরু করে। নিজেকে এই বলিয়া প্ররোচিত করে যে, একবার অন্ততঃ করিয়া নেই, পরে আর কখনও করিব না। এই রোগের এলাজ হইতেছে,—তুমি পাল্টা নফছকে বল, এইবার বিরত হও, আবার সুযোগ আসিলে বরং বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। দ্বিতীয়বারও যদি সুযোগ আসে তবে তখনও তুমি উহাকে সেইভাবে ধোকা দাও, নফছ যেভাবে তোমাকে ধোকা দিয়া থাকে। অর্থাৎ তুমি এইবারও নাফছকে ডাকিয়া বল, এইবার আমাকে

ছাড়িয়া দাও, আর কোন সময় মওকা হইলে বরং তোমার দাবী মিটানো যায় কিনা, দেখা যাইবে।

'ক্বালবের এস্তেক্বামাত' বা অন্তরের দৃঢ়তা অর্জ্জন করার অর্থ হইতেছে, অন্তর যেন আল্লাহর জিকির এবং খোদায়ী জলওয়ার রত্নভাণ্ডারে পরিণত হইয়া যায়। অন্তর সদাসর্বদা যেন এই ব্যাপারে সতর্ক থাকে যাতে করিয়া অন্তরের সেই মনিকোঠায় এক আল্লাহর ধ্যান ব্যতীত আর কোন কিছুতেই স্থান করিয়া নিতে সমর্থ না হয়। যদি কখনও অন্য কিছু তাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, যা নিতান্তই স্বাভাবিক, তবে তা যেন আশ-পাশেই থাকিয়া যায়, স্থায়ীভাবে হৃদয়মধ্যে বাসা করিয়া বসিতে না পারে। হৃদয় মন্দিরের একান্ত প্রদেশকে সদাসর্বদা আল্লাহর জিকির ও ধ্যানের মধ্যে সোপর্দ্দ করিয়া দিয়া অন্য সব কাজকর্ম অন্তরের স্থুল পৃষ্ঠেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। গভীরে প্রবেশাধিকার দেওয়া চলিবে না। মোটকথা, অন্তরকে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্যকোন কাজেই ব্যস্ত ইহতে দিওনা। কখনও যদি কোন দুর্দ্ধর্ষ শক্রসৈন্য তোমার অন্তরদেশ অধিকার করিয়াও ফেলে তবে যথাসম্ভব শীঘ্র তুমি তোমার হৃদয়রাজ্য উদ্ধার করিয়া তার মধ্যে আল্লাহর জিকিরের নিরঙ্কুশ চর্চা পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,—"তোমার রবকে ভুলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় স্মরণ কর।" (১)

হৃদয় মধ্যে জিকিরের প্রভাব গ্রথিত হইয়া যাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর প্রবৃত্তির উপর প্রধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করিয়া পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। কখনও কখনও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এমন নয়। তবে ভুল চুক হইয়া গেলেও নেকীর পাল্লা ভারীই থাকিয়া যায়।

এমনিভাবে অন্তর যদি অধিকাংশ সময় কুচিন্তার হামলা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে তবে ক্ষমা এবং আখেরাতে নাজাতের যোগ্য হওয়ার আশাই সমধিক।

---

(১) واذكر ربك اذا نسيت ۝

দ্বিতীয় পত্র

[আবুল হাছান মসউদ বিন মুহম্মদ বিন গাণেমের প্রতি জবাবী পত্র]

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!

তোমার প্রজ্ঞাপূর্ণ, এলেম এবং হৃদয়সুষমার সৌরভমাখা পত্র পাইয়া আনন্দাভিভূত হইয়াছি। বেশ কিছুকাল হইতে তোমার কোন লিপি না পাইয়া অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তোমার দীর্ঘ প্রবাস-জীবনে সবসময় আমি তোমার তরফ হইতে পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলাম। কারণ, পত্রের মাধ্যমেই সফরের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়ার আগ্রহ জাগিত। যে কঠোর সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তুমি বিদ্যা অর্জন করিয়াছ, সেই কঠোর সাধনার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি আন্তরিকভাবে পুলকিত হইয়াছি। আমার সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় তোমার মধ্যে আমি যে আগ্রহ উচ্চাকাংখা এবং কঠোর সাধনা সর্বোপরি প্রতিভার ছাপ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার পরিপূর্ণ আশা ছিল পরবর্তী জীবনেও তুমি পরিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখিয়া দ্বীন এবং সাধনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কায়েম থাকিতে সমর্থ হইবে। কর্মজীবনেও দ্বীনীকাজ তুমি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আনজাম দিতে পারিবে। কেননা, সততা এবং সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যে কাজ শুরু হয়, সত্যনিষ্ঠার মধ্যেই তার পরিণতি লাভ হইয়া থাকে।

তুমি এলমে ফেকাহ্‌ এবং সাহিত্যে উচ্চতর পাঠ সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছ। তবে স্মরণ রাখিও এলেমের ক্ষেত্রে কোন এক স্তরে আসিয়া থামিয়া যাওয়া দুর্বল প্রকৃতির অপরিনামদর্শী লোকের স্বভাব। তোমার কর্তব্য হইতেছে জ্ঞানরাজ্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে পৌঁছার চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা। আমি চাই, তুমি যেন অধিত বিদ্যার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া এলমে ফেকাহর এমন গভীর জ্ঞান অর্জ্জন কর যেন তদ্বারা সাধারণ মানুষ যথার্থ অর্থেই উপকৃত হইতে পারে। এমন এলেম আয়ত্ব করার চেষ্টা কর, যা সার্বিকভাবে আখেরাতের জীবনে কাজে আসে।

দ্বিনী এলেম শিক্ষা এবাদতের চতুর্থাংশ। তাছাড়া এই এলেমের মাধ্যমেই

সাধারণ মানুষের আইনগত সমস্যার সমাধান দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ সাধারণ মানুষ সাধারণতঃ লোভলালসা এবং রিপুর তাড়নায় পরস্পরে ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত জাহেল বিপুতাড়িত লোকদের রকমারি সমস্যাবলীর শরিয়ত-সম্মত সমাধান পেশ করার ব্যাপারে ফেকাহর এলেম বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে। তবে এই বিদ্যা সাধারণতঃ খোদায়ী রহস্যাবলীর তত্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় না। তবে ফেকাহর এলেম হাছিল করার উদ্দেশ্য যদি হয় বিতর্কমূলক বিষয়াদির ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকৃত সত্য তালাশ করা, তবে তার মধ্যে ভুল হইয়া গেলেও একটি ছওয়াব রহিয়াছে। আর সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারিলে তার ছোয়াব দ্বিগুন। অবশ্য সেই ছোয়াবের ভাগী শুধু তাঁহারাই হইবেন যাঁহারা এজতেহাদ করার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। ভুল হইয়া গেলেও যেহেতু নেক নিয়তের সঙ্গে প্রকৃত সত্যে পেঁছার উদ্দেশ্যে মেহনত হইয়া থাকে এই জন্যই একটি ছওয়াব তাঁহাদের জন্য অবধারিত থাকে। আর চিন্তাগবেষণা যদি সঠিক সিদ্ধান্তে গিয়া পৌছিয়া যায় তবে তজ্জন্য তাঁহারা দুইটি নেকীর ভাগী হন।

সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা না নিয়াই কিংবা শুধু বিদ্যার জোরে প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার হীন আকাংখা নিয়া যে ব্যক্তি ফেকাহ চর্চায় লিপ্ত হয়, তার পক্ষে খোদায়ী রহস্যের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই।

সকল এলেমের শেষ মনজিল খোদায়ী রহস্যজগত পর্য্যন্ত পেঁছার সৌভাগ্য শুধুমাত্র ঐ সমস্ত লোকের পক্ষে অর্জ্জন করাই সম্ভব যাহারা অনুভব করিতে পারে আত্মার কোন্ কোন্ অভ্যাস মুক্তির কারণ হয় এবং কোন্ কোনগুলি মানুষকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নেয়। এলেমের সঙ্গে সেই উত্তম গুণাবলীর সংযোগ ঘটিলেই কেবল আত্মার সকল অন্ধকার দূরীভূত হইয়া মানুষকে সর্বনিম্ন স্তর হইতে উদ্ধার করিয়া সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাইয়া দিতে পারে। এই গুণই তাহাকে বাতাইয়া দেয়, কোন সে রাস্তা যে রাস্তায় চলিয়া মানুষের আত্মা পরম প্রিয় এবং চির আকাংখিত মাওলার সকাসে পৌছিতে সক্ষম হয়। পরন্ত সে অবহিতও হইতে পারে যে, সেই পথে চলার অসুবিধাসমূহ কি কি এবং সেই রাস্তার পাথেয়ই বা কি কি?

স্থূল বিদ্যায় পারদর্শি কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে যদি সেই রাস্তার সামান্য একটু আলোও দেখানো যায়, তবে তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল বিদ্যাই অত্যন্ত তুচ্ছ এবং অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই এলেমের স্বাদ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কোন ধারনা করাই সম্ভবপর হয় না। কবির ভাষায়ঃ—"যে পাখী কোন দিন মিষ্টি পানির সন্ধানই পায় নাই, সে অবশ্য সবসময় লবনাক্ত পানিতে চঞ্চু ডুবাইয়াই তুষ্ট থাকে।

যেহেতু আমি তোমার মেধা প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ভালভাবে জানি এবং তোমার প্রকৃতির মধ্যে সেই পরম জ্ঞান লাভ করার উপযুক্ততা লক্ষ্য করিয়াছি, সেই জন্যই শরিয়তের গূঢ়তত্ব সম্পর্কিত সেই এলেম সম্পর্কে তোমাকে একটু সচেতন করিয়া দিলাম মাত্র। আল্লাহ তোমার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুণ।

তৃতীয় পত্র

উলামা এবং ইমামগণের প্রতি লিখিত একটি সাধারণ পত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন,—"দুনিয়া অভিশপ্ত। যা কিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাই শুধু লানত মুক্ত, অবশিষ্ট সবকিছুই অভিশাপের আওতাধীন।"

উচ্চ পদমর্য্যাদার মোহ এবং ধনসম্পদের বিস্তৃতির লোভই সকল দুর্ভাগ্যের বীজ। উপরোক্ত লোভ এবং মোহেই সকল সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। সম্পদের যতটুকু আখেরাতের পাথেয় এবং হাশরের সঞ্চয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় ততটুকুই শুধু নিরাপদ। হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে,—একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎপথে অর্জিত সম্পদ কতই না উত্তম!"

আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য নেকী, তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্য এবং দ্বীনের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একমাত্র উপায় হইতেছে আলেমগণের পক্ষে যথার্থ তাকওয়া অবলম্বন এবং তার মাধ্যমে সত্যিকারের নেক পন্থা অনুসরন। এই পথেই আলেমগণ আত্মার দুনিয়াতে প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। ওয়াছছালাম!

চতুর্থ পত্র

খাজা আব্বাছ খাওয়ারেজমকে লিখিত ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আপনার প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে শান্তি বর্ষিত হউক। দ্বিনী সম্পর্ক এবং এল্‌মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চাইতেও বড় এবং সুদৃঢ়। আপনার সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক কোন পরিচয় না হইলেও আত্মিক পরিচয় যতটুকু লাভ হইয়াছে, তা অত্যন্ত গভীর।

মানুষের সকল আত্মা একটি অনুশীলনপ্রাপ্ত লস্‌করের ন্যায়। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের দৃষ্টি আত্মার উপরই নিবদ্ধ হইয়া থাকে, বাহ্যিক অবয়বের উপর নয়। আমি আপনার কঠোর সাধনা এবং উন্নত চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথাই অবগত হইয়াছি। এই ভাবিয়া আন্তরিকভাবে আনন্দিত হইয়াছি এবং আল্লাহর শুকুর আদায় করিয়াছি যে, আজও দুনিয়ার বুক এমন সাধক লোক হইতে শূন্য হইয়া যায় নাই, যাঁহাদের মধ্যে দ্বিনী এলেম তাসাউফ ও শরীয়াতের ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে-কেরামের পরিপূর্ণ অনুসরণের আদর্শ পরিস্ফুট হয়। কেননা আজকের দিনে উপরোক্ত গুণাবলীর যে কোন একটি গুণ অর্জ্জন করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন উপযুক্ত আলেমের চরিত্রে সবগুলি গুণের একত্র সমাবেশ আরও কঠিন ব্যাপার।

আপনি যদি এই যোগ্যতা আল্লাহর বান্দাদিগকে দ্বীনের পথে আহ্বান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ সম্পর্কে পরিচিত করার কাজে ব্যয় করেন তবে ছাহাবায়ে কেরামের পরিপূর্ণ অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে। এই পথেই আপনি সাফল্যের শেষ মনজিল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইবেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ এবং তাহার কথা হইতে উত্তম কথা আর কি হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, নিজেও নেক আমল করে এবং বলে, আমি নিশ্চিতরূপে মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত।'' (১)

---

(১) ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين ०

পঞ্চম পত্র

ইবনুল আমেলের পত্রের জবাবে লিখিত ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর প্রেরীত রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লামের প্রতি দরুদ ও ছালাম।

জনাবের জ্ঞানসমৃদ্ধ বিস্তারিত পত্র পাইয়াছি। পত্রে আপনি যে প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আপনার এলেম, মর্য্যাদা এবং অন্তর্দৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকেন। আপনি যেন এলেমের হকীকত এবং সুক্ষ্ম তত্বজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হইতে পারেন।

এলেম যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রছুলে খোদার (দঃ) অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন ফল প্রদান করে তবে সেইরূপ এলেম সেই আলেমের পক্ষে অভিশাপে পরিণত হইবে। রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—যদি কোন ব্যক্তিকে বেশী এলেম দান করা হয় এবং সেই এলেম অনুপাতে তার হেদায়েত নছীব না হয়, তবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য হইতে বহু দূরে থাকিবে।''

সেই এলেমই প্রকৃত পথপ্রদর্শক যা তোমাদিগকে সৃষ্টির দিক হইতে ফিরাইয়া সৃষ্টিকর্তার দিকে, দুনিয়া হইতে আখেরাতের দিকে, অহঙ্কার হইতে বিনয়ের দিকে, লোভ-লালসা হইতে ত্যাগের দিকে, লোক-দেখানোর মনোবৃত্তি হইতে নিষ্ঠার দিকে, সন্দেহপ্রবণতা হইতে একীনের দিকে, ভোগ-স্পৃহার গোলামী হইতে তাকওয়া-পরহেজগারীর দিকে পরিচালিত করিয়া থাকে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত লোক দ্বিনী এলেমের চর্চায় লিপ্ত আছেন তাঁহারা সকলেই আল্লাহর পথের পথিক। আক্ষেপের বিষয় যে, এই ধারণা সত্য নয়। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—"যে এলেমের মাধ্যমে আল্লাহর

সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র কাম্য ছিল, যদি কেহ সেই এলেম দুনিয়ার ফায়দা লাভ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, তবে সেই ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ হইতেও বঞ্চিত থাকিবে।"

আলেমগণের পক্ষে এলেম একটি ভয়ের বিষয়ও বটে। ধনসম্পদ অর্জন করার মধ্যে যেসব ভয়-ভীতির সম্ভাবনা থাকে, এলেম অর্জন করার মধ্যে তার তুলনায় অনেক বেশী সম্ভাবনা। কেননা, ধন-দওলত দুনিয়াদারীরই উপকরণ। দুনিয়ার জীবনে সুখশান্তি লাভ করার উদ্দেশ্যেই ধন-সম্পদ অর্জন করা হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বিনী এলেমের সম্পর্ক একমাত্র দ্বীনের সঙ্গে। দ্বীনের সেই এলেম যদি দুনিয়ার ন্যায় তুচ্ছ বস্তু লাভ করার কাজে নিয়োজিত করা হয়, তবে তা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন,—যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুনিয়া কামাই করা হয়, সেইগুলি ব্যবহার করিয়া যদি কেহ দ্বীন অর্জন করিতে চায়, তবে সেইব্যক্তি তত বড় অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইবেনা, যত বড় অপরাধী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাহারা দ্বীন অর্জন করার উপকরণসমূহ দুনিয়া অর্জনের জন্য ব্যবহার করে।"

এর কারণ হইতেছে দ্বীন কামাই করার জন্যই দুনিয়ার উপকরণাদি তৈরী করা হইয়াছে, দ্বীনকে দুনিয়া কামাই করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। দুনিয়া একটি সেবক বিশেষ এবং দ্বীন তার সেব্য। যে ব্যক্তি মখদুম সম্মানীকে সেবকের ভূমিকায় নামাইয়া আনিয়া সেবকের সেবায় লাগাইয়া দেয়, সে নিঃসন্দেহে খোদায়ী কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে।

আল্লাহর নিয়ম নিজের হইতে পরিবর্তিত হয় না। তবে দুনিয়ার বুকে তার ছুরত এবং আবরণে পরিবর্তন হইয়া থাকে। চক্ষুর পক্ষে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা তখনই সম্ভব হইবে, যখন এই দুনিয়ার পর্দা তাহার সম্মুখ হইতে উঠিয়া যাইবে। এই দুনিয়ার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয় অন্য জগতের যবনিকা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হইয়া যাইবে। তখন তাহার দৃষ্টিতে কৃত্রিম আবরণ ভেদ করিয়া সবকিছুরই প্রকৃত স্বরূপ ভাসিয়া উঠিবে। আজ যা কিছু ভাব হিসাবে প্রকাশমান, তখন যেই সবই বাস্তব রূপ ধরিয়া আসিতে থাকিবে।

যেমন,—লোভী মানুষ নিজেকে সেই সময় গর্দভের আকৃতিতে দেখিতে পাইবে। অহঙ্কারী প্রতিহিংসা পরায়ণেরা নিজদিগকে দেখিতে পাইবে চিতা-বাঘের আকৃতিতে। হিংস্র ইতর প্রকৃতির লোকেরা নিজদিগকে হিংস্রচতুষ্পদের আকৃতিতে দেখিবে।

যেসব লোক দ্বিনী এলেমকে দুনিয়ার স্বার্থ অর্জন করার জন্য ব্যবহার করিয়াছে তাহারাও নিজদিগকে অত্যন্ত স্বল্প বিকৃত চেহারায় দেখিবে। ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিবেন :—তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে আজ সমস্ত পর্দা সরাইয়া নিয়া তোমার দৃষ্টিকে যথার্থ অর্থে তীক্ষ্ণ করা হইল।"

অন্য একস্থানে এই তথ্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে। "সেই দিন দেখিতে পাইবে, অপরাধীরা পরওয়ারদিগারের সম্মুখে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া বলিবে—"আয় রব! দেখিলাম শুনিলাম, এখন আমাদিগকে দুনিয়ায় ফিরিয়া যাইতে দাও, বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল হইয়া যেন তোমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারি।" (১)

আল্লাহর তরফ হইতে এই প্রার্থনার জবাব আসিবে,—"আমি কি তোমাকে এতটুকু সময় দেই নাই, যে সময়ের মধ্যে একজন শিক্ষাগ্রহণকারী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে! তোমাদের নিকট কি কোন ভয়প্রদর্শনকারী সাবধান করার জন্যও আসে নাই? আজ জালেমদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে না।"

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, আলেমগণকে সেইদিন কি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে!

যারা হাশরের দিন নিশ্চিতরূপেই বিপদগ্রস্ত হইবে ঐ সমস্ত আলেম-দিগকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম দল হইতেছে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাহাদের দায়িত্ব এবং সেই বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। অবশ্য এই ধরনের লোককে নামে-

---

(১) ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم - ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ০

মাত্রই আলেম নামে অভিহীত করা হয়। কুরআনের ভাষায় "এই সমস্ত লোকই গাফেল।" এবং এই গাফিলতির অবশ্যম্ভাবি পরিণতি হিসাবে—"নিশ্চয়ই আখেরাতে এইসমস্ত লোক ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" (১)

দ্বিতীয় দল হইতেছে, ঐ সমস্ত লোকের যাহারা সেই নিশ্চিত বিপদ সম্পর্কে অবহিত এবং তৎপ্রতি মৌখিক উদ্বেগও প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার কোন চেষ্টা করিতেছে না। ইহারাও ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

তৃতীয় দল হইতেছে, যাঁহারা এলমেদ্বীনের দায়িত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল হইয়া এলেমের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করিয়া থাকেন। এলেমকে দুনিয়া প্রাপ্তির সংস্পর্শে না আনিয়া একমাত্র আল্লাহর মারেফাত ও ফরমাবরদারীর পথে নিয়োজিত করিয়া রাখেন। ইহা অবশ্য নৈকট্যপ্রাপ্ত প্রথম যুগের মহাত্মাগণের অনুসৃত পথ। প্রথম যুগেই এই শ্রেণীর আলেম গণের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ধন্য সেই সমস্ত নরগণ, যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিয়াছে কিংবা তাঁহাদের সাক্ষাৎপ্রাপ্তগণকে দেখিয়াছে। হায়! যে সমস্ত ভাগ্যবান লোক সচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন আমরাও যদি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম!

উপরোক্ত তিনটি শ্রেণী সম্পর্কেই কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে ইশারা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—"ইহাদের মধ্যে কিছু লোক এমন, যাহারা স্বীয় আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। আর কিছু সংখ্যক সাবধানী এবং অবশিষ্ট কিছুসংখ্যক আল্লাহর অনুগ্রহে পূণ্যের কাজে অগ্রণী হইয়া থাকে!" (২)

দোয়া করি, আল্লাহতালা যেন আমাকে-আপনাকে এখলাছপূর্ণ নিষ্ঠাবান বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং খাছ অনুগ্রহের দ্বারা দুনিয়াদারদের ধোকা-ফেরেব হইতে পানাহ দান করেন।

---

(১) انهم فى الاخرة هم الخاسرون ٥

(২) فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ٥

ষষ্ঠ পত্র ঃ

[জনৈক তালেবে এলেমকে তাঁর অভিভাবকগণ এলেম শিক্ষার পথ হইতে সরাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিলে ইমাম সাহেব এলেমের মর্যাদা এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া অনিচ্ছুক অভিভাবকগণকে তাম্বি কয়ার উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।]

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহতালা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, সৌভাগ্যের প্রত্যাশীগণ এলেম এবং তাকওয়ার মাধ্যমেই তাঁর প্রিয় ও মর্য্যাদাবান হইতে পারে।

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে অল্প দুই-একজনই কেবল দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করিয়া এলেম হাছিল করার দিকে মনোযোগী হইয়া থাকে। যে সব লোকের পক্ষে এলেমের প্রতি আগ্রহী হওয়ার তওফীক হয় তাহাদের মধ্যে আবার অল্প সংখ্যকেরই মেধা এলেমের গূঢ়তম রহস্য অনুধাবন করিতে এবং হাকীকতের স্তর পর্য্যন্ত পেঁছার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। আবার যাহাদের প্রতিভা এবং অনুধাবনশক্তি দুই ই আছে তাহাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই এমন উন্নত চরিত্রগুণসম্পন্ন হইতে পারে যে, দ্বীনি এলেমকে দুনিয়ার শানশওকত লাভ করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না করিয়া এলেম ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করতঃ তাকওয়ার সম্পদকেই পাথেয় করিয়া সাধারণ মানুষের পথপ্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন।

এই শ্রেণীর মহাত্মাগণ সম্পর্কেই আল্লাহতা'লা এরশাদ করিয়াছেন,—"এবং তাহাদিগকে আমি ইমামের মর্য্যাদায় উন্নীত করিয়াছি যেন আমার নির্দ্দেশ মোতাবেক তাহারা অন্যদেরকে পথের সন্ধান দান করিতে পারে। কেননা, তারা ধৈর্য্যধারন করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনসমুহের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছে।" (১)

---

(১) وجعلنا هم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون -

ইহারা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত কখনও হয় না, যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে :—ইহাদিগকে ঐ সমস্ত লোকের বিবরণ পাঠ করিয়া শোনান, যাহাদিগকে আমি নিদর্শন দান করিয়াছিলাম। তৎপর উহারা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া গিয়াছে। অতঃপর শয়তান তাহাদের পশ্চাতে এমনভাবে লাগিয়াছে যে, শেষপর্য্যন্ত তাহারা গোমরাহ হইয়া গিয়াছে।" (১)

এই ধরনের লোক খুব কমই পাওয়া যায় যাহাদের প্রকৃতিতে এলেমে পূর্ণতা লাভ করার যোগ্যতা থাকে এবং তাহাদের মন-মেজাজ তাকওয়া গ্রহণ করার উপযোগীতাও রাখে। কারণ, এই পথে যাহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে তাহাদের পশ্চাতে এমনভাবে শয়তান মোতায়েন করিয়া দেওয়া হয়, যে শয়তান পদে পদে তার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। পরিপূর্ণতার মনজিলে পৌঁছার পূর্বেই তার গতিপথ বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য শয়তান সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া থাকে। সচরাচর যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন, সম্পদের স্পৃহা, বিষয়-সম্পত্তির ঝামেলা এবং পরস্পরের ঝগড়া-ফছাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতির ভূমিকাই প্রধান। কোন সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে এই সবগুলিই শয়তান বিশেষ।

তোমাদের একটি ছেলে হাতেগনা কয়েকজন ভাগ্যবানের অন্যতম, যাহাদের মধ্যে এলেম ও তাকওয়ার পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করার যোগ্যতা দেখা যায়। সুযোগ করিয়া দিতে পারিলে সে কামালিয়াতের স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে বলিয়া আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে। যার কল্যাণময় ফলশ্রুতি দুনিয়া-আখারাতে সকলের জন্যই শুভ হইবে।

এখন যদি তোমরা এই সম্ভাবনাময় ছেলেটিকে অনবরত বাড়ী ফিরিয়া আসার তাগিদ দিতে থাক, তাহাকে সুযোগ সুবিধা প্রদান হইতে বিরত রাখ কিংবা সহৃদয়তা প্রদর্শন না করিয়া রূঢ়তা অবলম্বন কর তবে তোমরা তাহার এলেম শিক্ষার পথে বাধাসৃষ্টিকারীদের মধ্যেই গণ্য হইবে। রছুলে মকবুল

---

(১) واتل عليهم نبأ الذى اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطن فكان من الغاوين -

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন,—তোমরা কেহ অপর ভাইএর বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিও না।"

আত্মীয়স্বজনের সহিত মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ করা অবশ্য এলেম হাছিল করার পথে বাধা হয় না। আমি তাহাকে এই উদ্দেশ্যেই অল্প কিছুদিনের জন্য তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিতেছি। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, বহু ছেলে লেখাপড়ার পূর্ণ মনোযোগী হওয়া সত্বেও অল্প কয়েকদিনের অবকাশে বাড়ীতে যায় এবং আত্মীয় পরিজনের মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া যায় যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মন হইতে এলেমের আগ্রহই বিলীন হইয়া যায়।

তোমাদের প্রতি আন্তরিক শুভকামনায় বশবর্তী হইয়াই যা কিছু বলার ছিল, সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিলাম। যে ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্ট করা হইয়াছে, তারপক্ষে সেই কাজ করাই সহজতর হইয়া থাকে। সুসংবাদ সেই সমস্ত লোকের জন্য যাহাদিগকে কল্যাণ লাভ এবং কল্যাণপ্রদ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সৃষ্ট করা হইয়াছে।"

সপ্তম পত্র

(কাজী ইমাম সায়ীদ এমাদুদ্দিন মুহম্মদ ওয়ায্‌যানকে কোন এক ব্যক্তির প্রতি সুনজর দেওয়ার সুপারিশ করিয়া লিখিত)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!

দেশবাসীর কল্যানার্থে আপনার দ্বারা অনুসৃত সুব্যবস্থার অনেক খবর আমার নিকট পৌঁছিয়াছে।

: মুমিনগণ পরস্পরে একই প্রাণের সমতুল্য।"—এই দিক বিবেচনায় বিশেষতঃ এলেমের ময়দানে বিরাজমান সাধারণ সম্পর্কের খাতিরেও পরস্পরের পরিচয় নিবিড়তর করা এবং সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এলেমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হইতেছে আমাদের অনুসরনীয় পূর্ববর্তী উলামাগণের আদর্শ চরিত্র এবং জীবনাদর্শের অনুকরণ। ইহাই পরকালের জন্য মূল্যবান সম্পদ হইয়া থাকিবে। উম্মতের পক্ষে আলেমগণের

অনুসরণ করার মাপকাঠিও সেই চরিত্র অনুসরণের মাপকাঠিতেই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যদি কাহারো মধ্যে পূর্ববর্তী আদর্শস্থানীয়গণের চরিত্রের যথার্থ ছাপ পরিলক্ষিত হয় তবে তার চাইতে আনন্দের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

অপরপক্ষে সেই অনুসরণীয় আদর্শ চরিত্রের বিপরীত যদি কাহারো মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তবে সংশ্লিষ্ট আলেমের পক্ষে এরচাইতে বড় বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। এইরূপ বিপদে আক্ষেপ প্রকাশ করা প্রত্যেক সচেতন লোকেরই কর্তব্য।

অপ্রয়োজনীয় পত্র আদান-প্রদানও যেহেতু এক ধরণের লৌকিকতা, সেইজন্য প্রয়োজন ব্যতীত আমি সাধারণতঃ পত্র লিখিতে উদ্বুদ্ধ হই না। কেননা আল্লাহ তা'লা বলেন,—"তাহাদের অধিকাংশ আলোচনার মধ্যেই কোন কল্যান নাই। তবে দুস্থদের সাহায্য, সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং মানুষের মধ্যে সংস্কার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে যে সব আলোচনা হয়; সেইগুলি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" (১)

পারস্পরিক পত্র আদান-প্রদানও এক ধরণের আলোচনা বৈ আর কিছু নয়। সুতরাং অর্থহীন পত্রের ব্যাপারেও কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত প্রযোজ্য হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

আজকের এই পত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে, একজন যোগ্য প্রতিভাবান মোত্তাকী আলেমের প্রতি আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করা। ইনি বহুগুণে গুনান্বিত একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি একটি জরুরী কাজে আপনার এলাকায় যাইতেছেন। ইঁহার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি এবং আন্তরিক সদ্ব্যবহার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এমন একজন আলেমের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন যেমন অফুরন্ত নেকীর কারণ হইবে, তেমনি আমাদের সকলের তরফ হইতে কৃতজ্ঞতা ও নেক দোয়ার কারণ হইয়া থাকিবে।

---

(১) لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف او اصلاح بين الناس ০

অষ্টম পত্র

(মানব প্রকৃতির বিভিন্ন দিক, যুহ্‌দ ও তাকওয়ার ব্যাখ্যা এবং চরিত্র গঠন সম্পর্কিত মুল্যবান উপদেশ সম্বলিত একটি সাধারণ পত্র।)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

দ্বীনের পথে অনেক দুর্গম কঠিন আবর্তের সম্মুখীন হইতে হয়। পথ-পরিক্রমার সবগুলি ঘাটি মোটামুটিভাবে দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় জীবনের ব্যবহারিক দিক, দ্বিতীয় অধ্যায় আল্লাহর মারেফাতের দিক।

ব্যবহারিক দিকটি জীবন-পুস্তিকার ভূমিকা, মারেফাত মুল কিতাব সাদৃশ। ব্যবহারিক জীবনের শুরুর কথা হইতেছে হালাল খাদ্য গ্রহণ আর শেষ মনজিল হইতেছে সকল আমলের মধ্যে এখলাছ সৃষ্টি করা। এই শেষ মনজিলটি অতিক্রম করার পরই মারেফাত অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই অধ্যায়ের প্রথম শিরোনামা হইতেছে কলেমা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর হাকীকত। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের পবিত্র যবানে এই হাকীকত নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"সৃষ্টির আদি পুস্তকের মধ্যে প্রথম যে কথাটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে; "আমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। আমার রহমত ক্রোধ হইতে বিস্তৃততর।" (১)

ব্যবহারিক জীবনের পৃষ্ঠাতেও এই একই কথাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তবে তা শুধুমাত্র আকীদার স্তর পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ। মারেফাত অধ্যায়ে এ কলেমার হাকীকত যে ভাবে প্রকাশমান হইতে থাকে, ব্যবহারিক জীবনে সচরাচর তা হয় না। ব্যবহারিক জীবনের সকল শর্তাদি পূরণ করিয়া মারেফাত অধ্যায়ে প্রবেশ করার পরই বাকলের ভিতর হইতে যে ভাবে

---

(১) اول ما خط الله تعالى في الكتاب الاول لا اله الا انا وسعت رحمتي من غضبي ০

ফলের প্রয়োজনীয় অংশটুকু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে ঠিক তেমনি-ভাবে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া উপরোক্ত কলেমার হাকীকতের স্তর পর্য্যন্ত পেঁাছা সম্ভবপর হয়।

মারেফাত অধ্যায়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করাই ভাল। কারণ, সাধকগণ এই অধ্যায়ের যে সব স্তর একে একে অতিক্রম করিতে থাকেন, সেইগুলি ব্যাখ্যা বা বর্ণনার ব্যাপার নয়। যারা এই মনজিলে পৌঁছিতে পারেন নাই তাহাদের নিকট উহা বোধগম্য হয় না। এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া শত্রুতা ক্রয় করিয়া লওয়ারই নামান্তর মাত্র। অবশ্য ব্যবহারিক জীবনের অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা বিস্তারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা সাধারণের জন্য লাভজনকও বটে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জীবনের এই অধ্যায়ের সূচনা হয় হালাল খাদ্য হইতে। হালাল রোজী এবং জীবনযাত্রার মধ্যেও যুহ্‌দ ও তাকওয়ার চারিটি স্তর রহিয়াছে।

প্রথম জায়েযের স্তর। যতটুকু তাকওয়া থাকিলে শরিয়তের আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয় বা কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে অন্ততঃ ততটুকু তাকওয়া অর্জন করা। সাধারণভাবে ফেকাহর আলেমগণ যে সব জিনিষকে হারাম ফতুয়া দিয়া থাকেন, অন্ততঃ ততটুকু হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে এই স্তর হাছিল করা যায়।

দ্বিতীয় স্তর হইতেছে সৎকর্মশীলগণের যুহ্‌দ ও তাকওয়া। এই স্তরের তাকওয়া অবলম্বন করিয়া সৎকর্মশীল নেক লোকগণ সন্দেহজনক বস্তুও পরিত্যাগ করিয়া চলেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে সরাসরি হারাম না হইলেও যে সব জিনিষে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, ঐগুলি তাঁহারা কখনও ব্যবহার করেন না।

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম একদা কয়েকজন ছাহাবীকে বলিয়াছিলেন, মুফতীগণ কোন বস্তুর স্বপক্ষে ফতওয়া দেওয়ার পরও তুমি তোমার অন্তরের নিকট হইতে ফতুয়া গ্রহণ করিও।" অন্য এক প্রসঙ্গে এরশাদ করিয়াছেন,—"যা কিছু তোমার নিকট সন্দেহজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তা ত্যাগ করিয়া যাহা সন্দেহমুক্ত তাই গ্রহণ কর।" (১)

---

(১) دع ما يريبك الى ما لا يريبك

এই স্তরের যুহ্‌দ-তাকওয়া ফরজ নয়, তবে ফযিলতের বিষয়। যাঁহারা তা গ্রহণ বরিতে পারেন, অফুরন্ত ফযিলত লাভ করিতে সমর্থ হন।

তৃতীয় স্তর প্রকৃত মোত্তাকীগণের যুহ্‌দ। নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,—"কোন ব্যক্তি সেই পর্য্যন্ত মোত্তাকী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না সে সন্দেহমুক্ত বিষয় সমূহও শুধু এই আশঙ্কায় ছাড়িয়া না দেয় যে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত উহাতে সন্দেহের কিছু বাহির হইয়া আসিতে পারে!"

হযরত আবুবকরের (রাঃ) দৃষ্টান্ত এই ব্যাপারে স্মরণ করা যাইতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কোন কথাই যেন বলিতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি মুখের মধ্যে পাথরের টুকরা পুরিয়া রাখিতেন। তাঁহার ভয় ছিল, অসাবধান মুহূর্তে হঠাৎ করিয়া যদি মুখ হইতে কোন অপ্রয়োজন কথা বাহির হইয়া পড়ে!

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) ঘরে আসিয়া অনুভব করিলেন, হাতের অঙ্গুলী হইতে মেশকের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে। মনে পড়িল, বাইতুল মালের মেশক বণ্টন করার সময়ই এই সুগন্ধ তাঁহার হাতে লাগিয়াছিল, যা তখনও রহিয়া গিয়াছে।

এই গন্ধটুকুর মধ্যে দোষের কোন স্পর্শও ছিল না. তথাপি হযরত ওমর মাটিতে ঘষিয়া এমনভাবে হাত ধুইলেন যাতে মেশ্‌কের গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায়। বাইতুল মালের কস্তুরীর এতটুকু গন্ধও তিনি নিজের জন্য বিধেয় মনে করেন নাই। তাঁহার ভয় ছিল, সামান্য ব্যাপারে কঠোর না হইলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এর চাইতে বড় বিষয়ও গা সওয়া হইয়া যাইবে।

চতুর্থ স্তর হইতেছে সিদ্দীকগণের যুহ্‌দ ও তাকওয়া। আল্লাহর রাহে চলিতে গিয়া যতটুকু প্রয়োজন তার বাহিরে অন্যান্য হালাল মোবাহ সবকিছু পর্য্যন্ত নিজেদের জন্য ইঁহারা হারাম সাব্যস্ত করিয়া নেন। ইঁহারা আহার করেন আল্লাহর জন্য অর্থাৎ এবাদত-বন্দেগীর শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে; রাত্রে একটু আরাম করেন শুধু শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার মত শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে। তাঁহারা মুখ খুলেন আল্লাহর জিকিরের নিয়াতে, নিরব হন ধ্যানমগ্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁহাদের প্রতিটি অভিব্যক্তি হইতেই তীক্ষ্ণব্যক্তিত্ব ফুটিয়া বাহির হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁহারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই নিয়োজিত রাখেন!

জীবন পুস্তকের ব্যবহারিক অধ্যায়ে হালাল ও হারাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর তিনটি স্তরের সম্মুখীন হইতে হয়।

প্রথমতঃ যারা প্রকাশ্য হারাম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমস্তরের যুহ্‌দ-তাকওয়া অর্জন করিতে সমর্থ হন, ইহারা সংসার জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া মধ্যম পন্থায় জীবন-যাপন করিতে পারেন। কিন্তু যারা এই মধ্যম স্তরটুকুও অর্জন করিতে পারে না বা এতটুকু অর্জন করার ব্যাপারে আলস্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহারা জালেমদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা প্রথমস্তরের তাকওয়া অর্জন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, বরং অগ্রসর হইয়া আরও উন্নতি করিতে চায়, তাহারা প্রথম যুগের বুযুর্গগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ যাহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্তর অর্থাৎ সিদ্দীকগণের তাকওয়া অর্জন করার সাধনায় অবতীর্ণ হন, তাঁহারা প্রথমযুগের সর্বাগ্রগন্য মহাত্মাগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

আখেরী জমানায় অবশ্য সিদ্দীকগণের স্তরে পেঁছার আকাংখা বাস্তবায়িত হওয়া খুবই কঠিন, এমন কি অসম্ভব ব্যাপার। তবে এইরূপ আশা করা যে, যে সমস্ত লোক এই ফেত্‌নার যুগেও প্রথম স্তরের সাধারণ যুহ্‌দ-তাকওয়া অর্জন করিতে সমর্থ হইবে তাহাদিগকে পর্ববর্তী বুযুর্গগণের মর্তবা দেওয়া হইবে।

রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

: শীঘ্রই মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যখন তোমাদের এক দশমাংশ আমলও যদি কেহ করিতে পারে তবেই মুক্তি পাইয়া যাইবে।"

জিজ্ঞাসা করা হইল, এই মর্তবা পাওয়ার অর্থ কি? জবাব দিলেন, কেননা, তোমরা তো নেক কাজ করার ব্যাপারে অনেক সহায়তা পাইয়া থাক।"

একশ্রেণীর লোক এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, "যারা কৃষি অথবা ব্যবসায়ের আয়ের উপর জীবন যাপন করে তারা মুক্তি পাইবে, আর যারা সরকারী বৃত্তি ভোগ করে বা যে কোন ভাবে শাসক সম্প্রদায়ের তরফ হইতে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হয় তারা সকলেই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত, এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা, ব্যবসার মধ্যেও নানা দোষের

সংমিশ্রণ হইয়া থাকে। তাই ব্যবসার আয় এবং ব্যবসার ধরণ সম্পর্কেও সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

রাজা-বাদশাদের মালের ব্যাপারেও সাবধানতা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ইহাদের সম্পদ তিন প্রকার হইয়া থাকে।

প্রথম প্রকার,—যে সব মাল জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়, জবরদস্তিমূলক ভাবে জরিমানা আদায়, সীমাতিরিক্ত কর প্রভৃতির আয় হইতে বৃত্তি বা ভাতা গ্রহণ করা যাইবে না।

কিন্তু শাসক যদি সুবিচারক হয় এবং নিয়ম মাফিক কর রাজস্বের বাহিরে জুলুমের কোন অর্থ তাঁহার নিকট না থাকে তবে এইরূপ শাসকের বৃত্তি-ভাতা গ্রহণ করিতে দোষ নাই। যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁরা মধ্যপন্থীদের মধ্যে বিবেচিত হইবেন, জালেম বলিয়া চিহ্নিত হইবেন না। জায়গীরদারীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য হইবে। আইনসিদ্ধ পন্থায় জায়গীর লাভ করিয়া উহার আয় দ্বারা ভরণ-পোষণ হইলে মধ্যপন্থীদের তাকওয়া-পরহেজগারীতে কোন ক্ষতি হয় না।

তৃতীয় প্রকার হইতেছে, যে সম্পদ জুলুম করিয়া সঞ্চয় করা হয় কিংবা প্রজা সাধারণের নিকট হইতে যাহা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হয়। এই শ্রেণীর মাল সম্পূর্ণ হারাম। এইরূপ মাল কোন মোত্তাকী লোকের জীবিকা হইতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইল, যদি কেহ এই ধরণের মালের উত্তরাধিকারী হয় কিংবা পরোক্ষভাবে যদি উপরোক্ত শ্রেণীর হারাম মাল কাহারো হাতে আসিয়া পড়ে তবে সেই মাল কি করিতে হইবে?

এই শ্রেণীর মালের প্রথম হক হইল, যাহাদের মাল ছিল তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায়, কিংবা কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে তোহ্‌ফা হাদিয়া বাবদ এইরূপ মাল আসিয়া পড়ে, তবে সেই মাল দ্বারা কোন জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে অথবা আলেম-দরবেশগণের প্রয়োজনে বিলাইয়া দেওয়া উচিত। কেননা, মাল ফেরৎ দিলে ফাছাদের সম্ভাবনা থাকে। হয়ত সেই মাল আরও অধিকতর জুলুম বা কোন পাপকাজে মদদ দেওয়ার পথে ব্যয় হইতে পারে।

এইরূপ মাল যার হাতে আসে সে যদি দরিদ্র হয়, তবে তার জরুরী প্রয়োজন মিটানোর পরিমানে ব্যয় করিতে পারে। অবশিষ্ট অংশ ফকীর-দরবেশ ও তালেবে এলেমগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। যদি ধনী হয়, তবে নিজের জন্য মোটেও খরচ না করিয়া সবটুকুই আলেম-দরবেশগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত।

যে দরিদ্র আলেম বা দরবেশ উপরোক্ত ধরণের মাল হইতে নিজের জরুরী প্রয়োজন মিটানোর জন্য খরচ করে, সেই ব্যক্তিও মধ্যমপন্থী মোত্তাকীগণের মধ্যেই শুমার হইবে,—জালেম বিবেচিত হইবে না।

এক ব্যক্তি আমাদের খানকায় অবস্থান করিত। তাহার চরিত্র খুবই উন্নত ছিল। পরিবার-পরিজনের ব্যয়-ভার বাড়িয়া যাওয়ার পর আমরা তাহাকে সরকারী ওয়াকফ এবং বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন মিটানোর অনুমতি প্রদান করিয়াছি।

আজকের যুগে উলামা এবং দরবেশগণের পক্ষে পরিবার-পরিজনের ব্যয়-ভার বহন করা এতই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকের পক্ষেই পেরেশানীর শিকার হইতে হইতেছে। সকল ভাইদের প্রতি আবেদন, এই শ্রেণীর লোকের সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। মাশায়েখগণের পক্ষেও এই শ্রেণীর লোকের আর্থিক অসুবিধার প্রতি খেয়াল করা দরকার।

সবাইর প্রতি ছালাম।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

অমূল্য উপদেশাবলী

আলেমগণের উদ্দেশ্যে

উপদেশ চাওয়া এবং উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু তা কবুল করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশেষতঃ যাহারা এলেম-চর্চায় নিয়োজিত তাহাদের পক্ষে কঠিনতর। কেননা, তাহারা মনে করে, এলেমই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণতঃ ইহারা আমলের ব্যাপারে উদাসীন, অথচ আমলের প্রতি তাহাদেরই বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, আমলের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, এলেমের প্রতি নয়।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে,—"হাশরের দিন সেই সমস্ত আলেমকে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি প্রদান করা হইবে, যাহাদের এলেম দ্বারা কোন ফায়দা হয় নাই।"

সুতরাং যে সমস্ত জ্ঞানী হাশরের দিন সৌভাগ্যবান হইতে চায়, এবং এলেম তার জন্য ক্ষতির কারণ না হউক এরূপ আকাংখা রাখে তাহাদের পক্ষে চারিটি বিষয় হইতে সর্বদা দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে।

(এক) কখনও বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে না। কেননা, ইহাতে অর্থহীন মেহনত ছাড়া আর কোন ফায়দা হয় না। অনর্থক বিপদ ডাকিয়া আনাই সার হয়। ইহা চরিত্র হননের উৎসও বটে। রিয়া, হাছাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, এবং আত্মম্ভরিতার ন্যায় অনভিপ্রেত দোষগুলি এর মাধ্যমেই বেশী করিয়া সৃষ্টি হইতে দেখা যায়! অবশ্য যদি কোন বিষয় বুঝিতে অসুবিধা হয় এবং তা জানা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেই বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝিয়া নেওয়ার নিয়াতে বহছ-মুনাজারা করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রেও নিয়ত ঠিক আছে কিনা, তা যাচাই করার দুইটি পথ রহিয়াছে। প্রথমতঃ যদি বিরুদ্ধবাদীর মুখ হইতে হক প্রকাশিত হয় এবং তাহার যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয় সৃষ্টি হইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার দ্বিধা না আসে। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্যে লোক

ডাকিয়া বিতর্ক করার পরিবর্তে নিরিবিলিতে যদি বিতর্ক করায় আগ্রহ বেশী হয়।

(দুই) অন্যের সম্মুখে ওয়াজ-নছিহত করিতে যাইও না। হযরত ইসা আলাইহিস সালামের প্রতি প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল,—হে মরিয়ম-তনয়! সর্বপ্রথম তুমি তোমার 'নাফছ'কে উপদেশ প্রদান কর। সে যদি পরিপূর্ণ রূপে সেই নছিহত কবুল করিয়া নেয়, তবে অন্য লোককে উপদেশ দিও। তা না হইলে তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে।'' হযরত ঈসার প্রতি প্রদত্ত এই নির্দেশটুকু খুব ভালভাবে স্মরণ রাখিও।

যদি আত্মীয়-স্বজন এবং আপনজনদের মধ্যে উপদেশ প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে সুর করিয়া কথার মিল সৃষ্টি করার জন্য ছন্দোবদ্ধ কথা বলা বা ভাষা প্রয়োগের বাহাদুরী দেখাইয়া লোককে তাক লাগাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিও না। মনে রাখিও, আল্লাহ তালা কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণকারীদিগকে পছন্দ করেন না। কবিতার ছন্দে কথা বলা এবং ভাষার বাহাদুরী প্রদর্শন অন্তরের খারাবির পরিচায়ক।

উপদেশ দেওয়ার অধিকার শুধু তাহারই রহিয়াছে যে ব্যক্তির অন্তরে আখেরাতের ভয়াবহ আজাবগজব সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া মহববতের সহিত অপরাপর সকলকে সেই বিপদ হইতে সাবধান করার আগ্রহ পয়দা হয়। এমতাবস্থায় যেরূপ ভাষা ব্যবহার করা দরকার তার মধ্যে সুর তাল মান বা কাব্য করার অবকাশ কোথায়? মনে কর, এক ব্যক্তি দেখিতে পাইল, বন্যার পানি ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দরজা পর্য্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে। একটু পরই তা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভয়ানক বিপদের সৃষ্টি করিবে। এমতাবস্থায় ঘরের ভিতরে নিদ্রিত মানুষকে ডাকিয়া আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করার জন্য কি ছন্দোবদ্ধ কথার ফুলঝুড়ি সৃষ্টি করা শোভন হইবে?

আখেরাতের ভয়াবহ আজাব সম্পর্কে অন্তরের মধ্যে যে ভয় সৃষ্টি হয়, সেই সম্পর্কে অন্যকে সাবধান করার নামই ওয়াজ। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ সেই ভয়ের কথা যেরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাষাতেই উপদেশাবলী উচ্চারণ করা উচিত।

ওয়াজ করার সময় অন্তরে যেন ঘুণাক্ষরেও এমন ধারণায় সৃষ্টি না হয় যে, তোমার ওয়াজ শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণের তরফ হইতে প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হউক, লোকে বাহ বাহ করুক, চারিদিকে প্রশংসাবাণীর স্রোত প্রবাহিত হউক। লোক তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া যেন বলিতে শুরু করে যে, আহ হা! কি অপূর্ব ওয়াজই না করিলেন, এমন অপূর্ব বক্তৃতা আর শুনি নাই! এইরূপ ধারণা মনে স্থান দেওয়া রিয়াকারী এবং গাফেল অন্তরের দলীল।

বক্তৃতার সময় অন্তরে শুধুমাত্র আকাংখা এবং প্রত্যয় থাকা চাই যে, মানুষের অন্তর যেন দুনিয়া হইতে আখেরাতের দিকে, লোভ-লালসা হইতে যুহদ তাকওয়ার দিকে, গাফলতের নিদ্রা হইতে জাগরণের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়। মহফিল হইতে উঠিয়া যাওয়ার সময় যেন অন্তরে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নিয়া বাহির হইতে পারে। ওয়ায়েজের মনের মধ্যে এমন আকাংখা যেন জাগ্রত থাকে যে, আল্লাহর যে সমস্ত নির্দেশ মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে, তা যেন নতুন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়।

গোনায় লিপ্ত মানুষ যেন সেই গোনাহ হইতে দূরে সরিয়া আসার প্রেরণা লাভ করে, সার্বিক ভাবে যেন মানুষের অন্তর আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যে ঝুকিয়া পড়ে।

ওয়াজের দ্বারা যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্যে হাছিল না হয়, ওয়াজ শ্রবণের পর মানুষের মধ্যে যদি কোন প্রকার পরিবর্তনের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে দেখা না যায়, তবে সেই ওয়াজ বয়ানকারী এবং শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(তিন) রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। সরকারী কর্মকর্তাদের সহিত উঠা-বসা এবং চলাফেরা করার আকাংখা যেন জাগ্রত না হয়। কেননা সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে চলা-ফিরা এবং উঠা-বসার বিপদ অত্যন্ত ব্যাপক।

যদি কেহ সরকারী সান্নিধ্যের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ে, তবে তার উচিত, শাসকগণের তারিফ করার ব্যাপারে যেন সাবধানতা অবলম্বন করে। কেননা, কোন ফাছেকের তারিফ করা হইলে অথবা কোন জালেমের জন্য আয়ুবৃদ্ধির

দোয়া করা হইলে আল্লাহ তা'লা অত্যন্ত রাগান্বিত হন বলিয়া হাদীছ শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। কেননা এর দ্বারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর নাফরমানিকেই সেই ব্যক্তি সমর্থন করিল।

(চার) কোন সরকারী বৃত্তি গ্রহণ করিও না। হালাল হইলেও তা এই জন্য গ্রহণ করা উচিত নয় যে, সরকারী বৃত্তির দ্বারা জাঁক-জমকপূর্ণ জীবন এবং লোভ-লালসা বৃদ্ধির সূচনা হইয়া থাকে। দ্বীনী জীবনে নানা প্রকার ফাছাদের সুত্রপাত হয়।

জুলুম-অত্যাচারের প্রতি নিরব সমর্থন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করিতে হয়। প্রতিবাদ কিংবা কঠোর ভাষায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করার সৎসাহস লুপ্ত হইয়া যায়, আলেমের পক্ষে এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

আলেমগণের পক্ষে উপরোক্ত চারিটি বিষয় হইতে দূরে সরিয়া থাকার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত চারিটি বিষয় উত্তম রূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(এক) সকল মানুষের সঙ্গে এমন উত্তম ব্যবহার করিবে, যেরূপ ব্যবহার তুমি অন্য লোকের নিকট সাধারণতঃ কামনা করিয়া থাক। কেননা, কাহারও ঈমান সেই পর্য্যন্ত পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপরের জন্যও তাই পছন্দ করিতে না পারে।"

(দুই) আল্লাহর সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক তা তুমি এমন ভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, তোমার একটি কিনা গোলামের পক্ষ হইতে তুমি যেমন আনুগত্য কর্তব্যপরায়নতা এবং সেবা আশা করিয়া থাক।

গোলামের যতটুকু অবাধ্যতা আলস্য বা অমনোযোগ তোমার নিকট অভিপ্রেত নয়, আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে এতটুকুও তুমি নিজের জন্য বিধেয় বলিয়া মনে করিও না।

(তিন) এলেম চর্চা কালে সব সময় তুমি এমন এলেমের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করিবে যে এলেম তোমার আখেরাতের জীবনে কাজে আসিবে।

মনে কর, কোন উপায়ে যদি তুমি জানিতে পার যে, আজ হইতে সাতদিন পরই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তখন এই সাতদিন কি তুমি কাব্য, গল্প কিংবা দর্শনের জটিল সমস্যাদি সম্পর্কে চিন্তা গবেষনা করিবে না মৃত্যু, মৃত্যুর পরের

জীবন এবং আখেরাতে নাজাত লাভ হইতে পারে যে এলেমের দ্বারা তাতে মনোযোগী হইবে?

ঠিক তদ্রুপ যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসিতে পারে, এই প্রত্যয় অন্তরে রাখিয়া অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধির উপায়-উপকরনাদির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি, সকল প্রকার অনাচার হইতে পাক-ছাফ হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই সকল সাধনা নিয়োজিত করিয়া রাখিবে।

কোন ব্যক্তি যদি এইরূপ খবর পায় যে, সপ্তাহ দিনের মধ্যেই বাদশাহ্ তাহার বাড়ীতে আসিবেন. তখন সেই ব্যক্তি অতি অবশ্যই সব কাজ-কারবার ত্যাগ করিয়া বাদশাহর অভ্যর্থনা এবং আদর-আপ্যায়নের আয়োজনে লাগিয়া যাইবে। বাড়ী-ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করন, বাদশাহর বসার আয়োজন এবং কাপড়-পোষাক পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করনের মধ্যেই তার সকল সাধনা নিয়োজিত হইবে।

উপরোক্ত ভূমিকার আলোকে চিন্তা করিয়া দেখ,—"আল্লাহ তোমাদের অবয়ব বা কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি দেন না, তিনি দেখেন শুধু তোমাদের অন্তর।" (১)

সুতরাং অন্তরকে কতটুকু সুসজ্জিত করা প্রয়োজন! জাহেরী আমল এবং শেকেল-ছুরত সুসজ্জিত করিয়া মুক্তি লাভ কখনও সম্ভব হইবে না।

আত্মা বা অন্তরের পক্ষে মুক্তির পথ কোনটি, কি কি উপায়ে অন্তর জগতকে সুসজ্জিত করা যায়, আর ধ্বংসাত্মক বিষয়াদিই বা কি কি তা সবিস্তারে এহ্ইয়া উল্ উলুম, কিমিয়ায়ে সাআদাত এবং জাওয়াহেরুল কুরআন গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইসব কিতাবে বর্নীত এলেমই তোমার পক্ষে জরুরী। অন্য সব বিষয়ে মনোনিবেশের উদ্দেশ্য অহঙ্কার, বিদ্যার বড়াই এবং অনিশ্চয়তার পিছনে ছুটা ছাড়া আর কিছু নয়। মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া এই সব বিদ্যার চর্চায় আখেরাতের কোন ফায়দা নাই।

---

(১) ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم وانما ينظر الى قلوبكم ०

(চার) দুনিয়ার জীবনে শুধু ততটুকু সম্পদ অর্জন কর, দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর যতটুকুতে তোমার পক্ষে কোন বিপদের সৃষ্টি করিতে না পারে। যতটুকু তোমার দ্বীন ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন এবং আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করার জন্য কাজে আসিতে পারে, সেইটুকুর মধ্যেই প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখ। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এতটুকু রিজিকের জন্যই দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"আয় আল্লাহ। মোহাম্মদের পরিবারের জন্য ততটুকু খাদ্য দাও, যতটুকুতে তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায়।"

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করিয়াছেন,—যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ দুনিয়ার সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছে, সে মৃত লাশ হাছিল করিয়াছে, কিন্তু সে তা অনুভব করিতে পারিতেছে না।"

জনৈক লেখকের প্রতি

(এক ব্যক্তি "বেদায়াতুল হেদায়া" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণকারীগণের মধ্যে কি কি গুনের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। লেখক এই মর্মে দাবী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই কিতাব পাঠ করিলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জিত হইবে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী উক্ত কিতাব সম্পর্কে স্বীয় অভিমত প্রদান করিতে যাইয়া লেখককে নিয়োক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম !

তুমি এই কিতাবে যাহা কিছু লিখিয়াছ, তা হেদায়েতের প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে কিছুটা পথ প্রদর্শন করিতে পারে, পরিপূর্ণতার পথ ইহাতে দেখানো হয় নাই।

পরিপূর্ণতার পথ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন, এক আত্মা, এক উদ্দেশ্য, এক ধ্যান এবং এক দৃষ্টির।

এক আত্মার অর্থ হইতেছে, অন্তরকে অতীত সম্পর্কে আক্ষেপ কিংবা স্মৃতিচারণে নিয়োজিত করিও না। ভবিষ্যতের চিন্তার মধ্যেও ডুবাইও না। অতীতের স্মৃতিচারণ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হইতে অন্তরকে মুক্ত করিয়া

বর্তমানের প্রতিটি শ্বাসের প্রতি একান্তভাবে নিবদ্ধ কর। অতীত বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান তোমার সম্মুখে, ভবিষ্যত আসিবে কিনা কিংবা তুমি তার সাক্ষাৎ পাও কিনা, সেই সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যে শ্বাসটুকু তুমি গ্রহণ করিতেছ, ঐটুকুই যেহেতু তোমার জন্য সুনিশ্চিত, তাই এইটুকুকেই পুঁজি হিসাবে গন্য করিয়া পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে চেষ্টা কর।

এক উদ্দেশ্যের অর্থ হইতেছে,—আত্মার মধ্যে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো ধ্যান প্রবেশ করিতে দিও না। তোমার দৃষ্টিতে, তোমার চিন্তায় তোমার আকাংখায় একমাত্র সেই পরম সত্বা ব্যতীত আর কাহারো যেন স্থান না হয়, সেইদিকে সদা সতর্ক থাকিও। তোমার যবানে যেন একমাত্র তাঁহারই যিকির হয়, তোমার দৃষ্টিতে যেন একমাত্র তাঁহারই রশ্মী উদ্ভাসিত হয়, সর্বদা যেন একমাত্র তাঁহারই ধ্যান জ্ঞান তোমার একমাত্র পাথেয় হইয়া থাকে।

এক ধ্যান অর্থ, একমাত্র আল্লাহ তা'লার ধ্যান ব্যতীত তোমার অন্তর হইতে অন্য সব ধ্যান মুছিয়া ফেল। তাঁর ধ্যান সম্পর্কিত যে সমস্ত কাজ হইতে পারে, তা ছাড়া আর যা কিছু আছে, সব কাজের চিন্তা অন্তর হইতে বাহির করিয়া দাও।

মনে রাখিও, দুনিয়া অভিশপ্ত। ফলে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই অভিশপ্ত। একমাত্র যা কিছু আল্লাহর সহিত সম্পর্কিত তাই অভিশাপ মুক্ত।" সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে প্রয়োজন নাই, এমন সবকিছু হইতে তোমার ধ্যান জ্ঞান সম্পুর্ণরূপে দূরে সরাইয়া রাখ।

এক দৃষ্টির অর্থ হইতেছে, তোমার দৃষ্টিপথে যা কিছু পতিত হয়, সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্বের নিশানী প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা কর। স্মরণ রাখিও সৃষ্টিজগতের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সবকিছুই অস্তিত্বের আকারে অন্য এক অস্তিত্বের ছায়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

অবশ্য সৃষ্টিজগতের প্রতি পরমানুতে পরম সত্বার অস্তিত্ব অনুধাবন করার মত দৃষ্টিশক্তি লাভ করার জন্য পর্য্যায়ক্রমিক সাধনার প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সাধনার সেই পর্য্যায়ক্রমিক স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে, কেবল মাত্র তাহার পক্ষেই হেদায়েতের প্রাথমিক স্তর হইতে চুড়ান্ত হেদায়েতের স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর হইবে।

বিভিন্ন ফেরকাবন্দী সম্পর্কে

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মত বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া যাইবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই মুক্তি-প্রাপ্ত হইবে এবং অবশিষ্ট সকল দল ধ্বংশের পথে চলিয়া যাইবে।

মূলতঃ অবশ্য উম্মতের মধ্যে দল তিনটি। একটি সর্বোত্তম লোকদের, একটি মধ্যপন্থীগণের এবং একটি সর্ব নিকৃষ্টদের।

সর্বোত্তম হইতেছে ছুফীগণের জামাত, যাঁহারা সকল আশা-আকাংখা আল্লাহর পথে সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন। সর্ব নিকৃষ্ট হইতেছে ফাছেক পাপীর দল, যাহারা আল্লাহর পথ ছাড়িয়া হারাম কাজ, জেনা শারাব জুলুম প্রভৃতিতে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির রশি ঢিলা করিয়া দিয়া ইহারা এইরূপ ধারনায় পতিত হইয়া রহিয়াছে যে, আল্লাহ গাফুরুর রাহীম, তিনি সবকিছু মাফ করিয়া দিবেন।

তৃতীয় দল হইল মধ্যপন্থীদের যাঁহারা সাধারণতঃ সৎকর্মশীল মোত্তাকী হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

উপরোক্ত তিন ধরণের লোকের মধ্যেই বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যে গুলি একত্রিত করিয়া একুনে বাহাত্তর ফেরকার জন্ম। কারণ শয়তান প্রত্যেক দলের মধ্যেই সদা সক্রিয় রহিয়াছে। সর্বোত্তম দল ছুফীগণের মধ্যেও শয়তান এমন সব সুক্ষ্ম ধোকার সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও হিংসা-বিদ্বেষের কবলে পতিত হইয়া যান। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে শুরু করেন।

গোনাহগার ফাছেকদের মধ্যে শয়তান যেভাবে ভুল আশার বানী শোনায় যে. যতকিছুই করনা কেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক সকলকেই ক্ষমা করিয়া দিবেন। তেমনিভাবে ছুফীগণের নিকট শয়তান হাজির হইয়া এইরূপ মন্ত্রনা দিতে শুরু করে যে, আল্লাহ তা'লা এই দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের বস্তু তো মানুষের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং এইসব ভোগ করার মধ্যে দোষ কোথায়? আল্লাহপাক তোমার এবাদতের মুখাপেক্ষী নন। তোমার দ্বারা কোন অন্যায় হইলে পর তদ্বারাও তাঁহার কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এত কঠোর সাধনার প্রয়োজন কি?

সৎকর্মশীলগণের মধ্যে শয়তান এই মর্মে মন্ত্রনা প্রদান করিয়া থাকে যে, এই দুনিয়ার নিয়ম-শৃংখলা এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করিয়া রাখার উদ্দশ্য হইতেছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। তোমাদের যেহেতু নৈকট্য লাভ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আর নিজেকে ভোগ-বিলাস হইতে বঞ্চিত রাখিয়া কষ্ট দেওয়ায় লাভ কি? এইরূপ করা তো নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর মাত্র।

ছুফীগণের অন্তরে শয়তানের এই ওয়াছওয়াছা কার্য্যকরি হওয়ার পর ধীরে ধীরে তাঁহারাও দুনিয়ার চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইতে শুরু করেন। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাঁহাদিগকে ক্রমান্বয়ে গোনাহর ময়দানে পা রাখিতে বাধ্য করিয়া দেয়। পরিবার-পরিজনের আকাংখা পূরণ, তাহাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ এবং প্রয়োজনের সীমারেখা বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে পতনের অন্ধকার গহ্বরে নিপতিত করিতে শুরু করে।

এই অবস্থায় একজন ছুফী এই কথা চিন্তা করার অবকাশ পায় না যে, আল্লাহ তা'লা গাফুরুর রাহীম এবং একই সঙ্গে কঠোর শাস্তি প্রদানকারীও। সান্নিধ্য হাছিল হওয়ার পর এবাদত বন্দেগী আরও বেশী করা প্রয়োজন। কেননা কোন ছুফীর সান্নিধ্য নবী-রছুলগণের সান্নিধ্যের বরাবর হইতে পারে না। অথচ নবী-রছুলগণের জীবনের কোন মুহূর্তেই কঠোর এবাদতের অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই, এহেন কোন কোন সন্দেহের মধ্যে পতিত হইয়া প্রতারিতও হন নাই।

শয়তান যখন কোন একজন ছুফীর অন্তরে এই ধরণের শূন্য প্রবনতার বীজ বপন করিতে সমর্থ হয়. তখন তার সাধনা সাফল্য মণ্ডিত হইয়া যায়। কেননা এরপর আর সেই ছুফীর পক্ষে দুনিয়ার লালসার আবর্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির কোন পথই খোলা থাকে না। লোভের কারাগারে বন্দী হওয়ার পর তার দ্বারা নতুন নতুন পাপ উদ্ভাবন সহজতর হইয়া পড়ে। ছুফী-দরবেশের পোষাকেই সেই সমস্ত লোক সমাজে অবস্থান করে। নিজদিগকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক হিসাবে পরিচিত করায়। স্মরণ রাখিও, এই

সমস্ত লোকই উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য এবং ক্ষতিকর। শয়তানের ধোকাপ্রাপ্ত এই শ্রেণীর লোকের মাধ্যমেই উম্মতের মধ্যে নানা ধরণের ফেরকা-বন্দীর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া নিরর্থক। শয়তান যাহাদের মনমস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। উহাদের বিবেক জাগ্রত করা কিংবা অন্তরে হেদায়েতের আলোকরশ্মী পূনঃ জাগ্রত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নতুন নতুন গোমরাহীর প্রবর্তক এই সমস্ত লোককে একমাত্র শাসনের মাধ্যমেই দমন করা সম্ভব,—এলেমের মাধ্যমে পথে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

একটি বিশেষ উপদেশ

(একব্যক্তি বহু দূরদেশ সফর করিয়া হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালীর নিকট উপদেশ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হাযির হইলে ইমাম সাহেব তাঁহার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন)

বিছমিল্লাহির-রাহমানীর-রাহিম!

আল্লাহ তা'লা বলেন,—"জিকির করিতে থাক, জিকির মুমেনদের উপকার করিয়া থাকে।"

যদি তুমি সৌভাগ্যের পথ অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া থাক তবে জানিয়া রাখ, এই পথের তিনটি মূলনীতি রহিয়াছে।

প্রথম,—কোন একটি মুহূর্তও আল্লাহর নাম স্মরণ করা হইতে গাফেল হইও না। জিকির বা স্মরণের ধারাবাহিকতা কোন সময়ই যেন ব্যাহত না হয়, সেই দিকে সতর্ক থাকিও।

দ্বিতীয়,—এমনভাবে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাক, যেন শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি পরাজিত হইয়া তোমার হাতে বন্দী হইয়া যায় এবং কোন একটি মুহূর্তও আল্লাহর জিকির হইতে তোমাকে বিরত করিতে না পারে।

নাফছ বা প্রবৃত্তি যদি তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তবে সে তোমাকেই তার গোলামে পরিনত করিয়া নেয়, এমন সব কাজে তোমাকে সর্বদা নিমগ্ন করিয়া রাখে, যেগুলি দ্বারা তার তৃপ্তি সাধন হয়, তুমি আল্লাহর দিক হইতে গাফেল হইয়া থাক।

তৃতীয় শরিয়তের নিয়ম-কানুন এমনভাবে অনুসরণ কর যেন তোমার সকল চিন্তাধারা শরিয়তের আজ্ঞাধীনে পরিনত হইয়া যায়। শরিয়তের যে কোন বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে চিন্তাধারা যেন মুহূর্তের জন্যও প্ররোচিত না হয়। তোমার ধ্যান-ধারনার সঙ্গে শরিয়তের চাহিদা যখন একাত্ম হইয়া যাইবে, তখন দেখিবে সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একমাত্র আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বও অবশিষ্ট থাকিবে না। তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর প্রতি অনুগত এবং নফছ পরিপূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়া যাওয়ার পরই সৌভাগ্যের শেষ মনজিল ঈমানের এবং মহোত্তম স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে।

এই পর্য্যায়ে পেঁছার পর যদি অদৃশ্য কোনকিছু দৃষ্টিগোচর হয়, কিংবা কোন প্রকার ইশারা বা শব্দ শুনিতে পাও, তবে সেই দিকে মোটেও খেয়াল করিবে না। এই সব ঘটনার প্রতি যেন তোমার অন্তর মুহূর্তের জন্যও আকৃষ্ট না হয়, এর কোন মূল্যও যেন তোমার মনে সৃষ্টি না হয়।

উপরোক্ত তিনটি মূলনীতিই চরম সৌভাগ্য লাভের পথে প্রধান তিনটি পাথেয়। এর উপরই কায়েম থাকিতে চেষ্টা করিও।

বিপদে ধৈর্য্যধারণ সম্পর্কে

(রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্যয়ের শিকার হইয়া উজির সেহাবুল ইসলাম ভিরমিজের দূর্গে বন্দী হইয়া গিয়াছিলেন। বন্দীদশা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া 'তুস'এ ফিরিয়া আসার পর জুমার নামাজ বাদ মসজিদে হুজ্জাতুল ইসলামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধারন কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করার পর সান্তনা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ইমাম সাহেব নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন)

আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন ঃ

আমি উহাদিগকে অতি অবশ্য সেই কঠিনতম আজাব ব্যতীতও ছোট ছোট আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব যদ্দরুণ হয়ত তাহারা ফিরিয়া আসিবে।" (১)

---

(১) ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ○

প্রিয়জনদের জন্য যেমন আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহরাশী সীমাহীন তেমনি অবাধ্য দুশমনদের জন্য তাঁহার ফাঁদেরও অন্ত নাই। দীর্ঘ চারিশত বছর ফেরাউনের সামান্য একটু মাথাব্যথাও হইল না। এই নিরুপদ্রব দীর্ঘ জীবনের স্বাদ উপভোগ করিয়াই তার অহঙ্কার এবং অবাধ্যতা এমন চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, সে দাবী করিয়া বসিল,—"আমিই তোমাদের রব, সবার বড় প্রতিপালক।

তিরমিযের দুর্গে বন্দীজীবন আল্লাহ রাববুল আলামীনের অপার অনুগ্রহ-রাশীর একটি তীর বিশেষ যদ্দ্বারা তিনি আপনাকে সাবধান করিয়াছেন, যেন তাঁহার পথে ফিরিয়া আসার মনোভাব জাগ্রত হয়। আর এর দ্বারা অনন্ত দুর্ভোগ হইতে উদ্ধার লাভ করার মত পথ অবলম্বন করিতে পারেন।

আল্লাহর তরফ হইতে এই সতর্কীকরণকে পরম নেয়ামত হিসাবে গন্য করিয়া তাঁহার পথে এমন ভাবে ফিরিয়া আসুন যেন সর্ব অঙ্গে তার বাস্তব নমুনা পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে।

সর্বাঙ্গে সাবধানতার প্রভাব ফুটিয়া উঠার অর্থ হইতেছে, দৃষ্টিশক্তির মধ্যে তার প্রভাবে এমন এক সুক্ষ্ম অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যদ্দরুণ দৃষ্টিপথে যা কিছু আসে, তার সবকিছু হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। একমাত্র আল্লাহর কুদরতের তামাশা ব্যতীত যেন তাতে আর কিছু ফুটিয়া না উঠে। যবানের মধ্যে সাবধানতা আসার পর উহা হইতে এক আল্লাহর জিকির ব্যতীত আর সব কিছু দূর হইয়া যায়। পদযুগলে যখন এই প্রভাব পড়ে, তখন সেই পা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ ছাড়া আর কোন দিকে অগ্রসর হওয়া পছন্দ করে না।

এক কথায়, আল্লাহ তা'লার তরফ হইতে সতর্কীকরনের যে ঢিল ছুড়া হয়, তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এমনভাবে অনুভূত হওয়া উচিত, যেন সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একমাত্র তাঁহারই আনুগত্য ব্যতীত অন্য সবকিছু হইতে ফিরিয়া যায়। কোন কিছুতেই যেন আর আগ্রহ অবশিষ্ট না থাকে। যদি সতর্কীকরনের ফল শুরু হয়, তবে সাময়িক সেই কষ্টকে অত্যন্ত মূল্যবান অনুগ্রহ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। অপরদিকে যদি সাময়িক বিপদাপদ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াও অন্তর আল্লাহ তা'লার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া না আসে, তবে তার পক্ষে আখেরাতের সেই কঠিনতম শাস্তির

জন্য অপেক্ষা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সেই আজাব শুধুমাত্র দোজখের আজাবই নয়,—আত্মার গভীরে এমন এক আগুন আল্লাহর তরফ হইতে সৃষ্টি করা হইবে, যা দোজখের আগুন হইতেও কঠিনতম।

ঃ আল্লাহর তরফ হইতে প্রজ্জলিত সেই আগুন অন্তরের গভীরতম কন্দর পর্যন্ত পৌঁছিবে।" (১)

অন্তরদেশে প্রজ্জলিত সেই আগুনই আল্লাহর পরম সান্নিধ্যে পৌঁছার পথে সেই দিন প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

ঃ কখনই তা হইবে না। সেই দিন ইহারা পরওয়ারদিগারের রহমত হইতেও বঞ্চিত হইয়া যাইবে। অবশ্য অবশ্যই উহারা জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জলিত হইতে থাকিবে। (২)

আল্লাহতা'লা সকলের অন্তর এবং জবানকে সেই কঠিনতম আজাব হইতে মুক্তি লাভ করার মত আমল করার তওফীক প্রদান করুন। এমন আমল করার শক্তি দিন যদ্দারা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও নৈকট্য লাভ করার পথ সহজতর হয়।

দোয়ার মধ্যে এখলাছের প্রয়োজনীয়তা

আকাশের ঘন কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় বিপদের ঘনঘটা চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। একের পর এক আসমানী বালা-মুছিবত নাযিল হইতেছে, যা দেখিয়া অন্তর পেরেশান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় দেখাযায়, সকলের প্রচেষ্টাই দুনিয়া হাছিল করার প্রতি নিবদ্ধ। সকল সাধনা একই পথে নিয়োজিত। আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া দুনিয়ার লোভ-লালসা, সহায় সম্পদ আহরণের বিরামহীন প্রতিযোগিতা এবং প্রবৃত্তির আকাংখা পূরণের সীমাহীন প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়ে না। অথচ ঃ— 'আল্লাহ তা'লা কোন জাতির পরিববর্তন সেই পর্যন্ত ঘটান না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী না হয়।

---

(১) نار الله الموقدة التى تطلع على الافئدة o

(২) كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم o

মানুষ যখন সর্বতোভাবে কেবলমাত্র দুনিয়ার ভোগবিলাসের পিছনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে, তখন দুনিয়াও তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে। এই অবস্থায় প্রতিকার করিতে হইলে সকলকে দুনিয়ার পিছনে চলার বদভ্যাস ত্যাগ করিয়া এবাদত-বন্দেগীর প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে।

মানুষ যখন আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইয়া যথার্থ অর্থেই দুনিয়ার পিছনে বিরামহীন ভাবে ছুটাছুটি হইতে দূরে সরিয়া আসিবে, দুনিয়ার লোভ-লালসা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আল্লাহর যথার্থ আনুগত্যের পাঠ গ্রহণ করিবে, দুনিয়ার স্বার্থ এবং মানুষের তারীফ প্রশংসার উর্দ্ধে উঠিয়া একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই এবাদত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভ করার উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

এই অবস্থায় পোঁছার পরই মানুষের আত্মা এবং আলমে আরওয়াহের মধ্যে এমন একটা নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, যদ্দরুন, সে যা কিছু প্রার্থনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাহা কবুল হয়। এমন নিষ্ঠাবান বান্দার মুখ হইতে কোন আকাংখা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তা'লা তা পূরণ করিয়া দেন। এইরূপ এখলাছপরায়ন আবেদ বান্দাগণের সম্পর্কেই বলা হইয়াছে :—

: তোমরা আমার নিকট দোয়ার হস্ত প্রসারিত কর, আমি তা কবুল করিব।"

স্মরণ যোগ্য যে, উপরোক্ত শর্ত ব্যবতীত দোয়া করিতে থাকা অর্থহীন। এইরূপ দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন।

—: তাম্মাত-বিল্খায়ের :—